জেলখানার দিনগুলি

মনোয়ার হোসেন রানা

www.nagorikpathagar.org

লেখক পরিচিতি

মনোয়ার হোসেন রানা একজন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মী। জন্ম ঢাকা জেলার ধামরাই থানার হালুয়া পাড়া গ্রামে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে অনার্স ও মাষ্টার্স করেছেন। তিনি ৯০ এর ডাকসু নির্বাচনে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। পর পর তিন টার্ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন। বলতে গেলে রাজনীতিকেই পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

বইটির দু'চারটি অনুচ্ছেদ দৈনিক ইত্তেফাকের মতামতের পাতায় প্রকাশের পর পাঠক ও বন্ধু মহলের যথেষ্ঠ সাড়া পেয়েছেন। দু'বার কারাজীবনের শৃংখলিত আবর্তে সহবন্দীদের অনুপ্রেরণায় 'জেলখানার দিনগুলি' বইটি লিখতে উৎসাহিত হয়েছেন।

ছাত্র রাজনীতির পথ পরিক্রমায় মনোয়ার হোসেন রানা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক, কেন্দ্রীয় সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

জেলখানার দিনগুলি

জেলখানার দিনগুলি

মনোয়ার হোসেন রানা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক ঃ
মেহের নিগার
সহকারী অধ্যাপক
উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ
প্রদ্যোৎ কুমার দাস

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ ঃ
অনিন্দ্য কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড (কাটাবন ঢাল)
ঢাকা-১২০৫

প্রাপ্তিস্থান ঃ
মামুন বুক হাউস
৭৩, ইসলামিয়া মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

রচিত ঃ
১৯৯৯-২০০০
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

প্রথম প্রকাশ ঃ
রজত জয়ন্তী
০১ জানুয়ারী ২০০৪
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

Inside The Jail
Monower Hossain Rana

মুল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org
www.pathagar.com

www.nagorikpathagar.org
www.pathagar.com

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org
www.pathagar.com

www.nagorikpathagar.org

জেলখানার দিনগুলি

উ ৎ স র্গ

কবিতাকে

যার ওপর সকল দায়িত্ব ছেড়ে

নিশ্চিন্তে জেল খাটতে পেরেছি।

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

আমি যা পারিনি আমাদের প্রিয় ছাত্র মনোয়ার হোসেন রানার হাতে সেই কঠিন কাজটি সম্পন্ন হতে দেখে আমি শুধুমাত্র প্রীতবোধ করছিনা, ভীষণভাবে গর্ব অনুভব করছি। জেলখানা এক অর্থে জীবন্ত মানুষের কবর। কবরের খবর যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, জেলখানার সঠিক চিত্রও তেমনি সবার অজানা। কিন্তু জেলখানায় অসংখ্য আদম সন্তান ধুঁকে ধুঁকে মরে। কত ফুল যে জেলখানায় ঝরে যায়, কত স্বপ্ন যে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, কত মানুষ যে 'অমানুষ' হয়ে নরকের অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হয় তার খবর কেউ রাখে না। যারা কারণে অথবা অ-কারনে জেলে যেতে বাধ্য হয়, জেল থেকে ফিরে এসে তারাও তা ভুলে যায়, কেননা দুঃস্বপ্নকে সবাই ভুলে যেতে চায়। কিন্তু ভুলে গেলেই যে জেল জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতার অবসান হয় না, জেলখানায়ও যে অসংখ্য মানুষ বাস করে এবং তারাও যে এই সমাজের মানুষ, তাদেরও যে মানবিক বোধ রয়েছে, সুখ-দুঃখের অনুভূতির অধিকারী যে তারাও এবং সমাজ সচেতন ব্যক্তি বর্গের যে তা ভোলা উচিত নয়, মনোয়ার হোসেন রানা সেই তিক্ত সত্যটি সবার সামনে উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত যত্নের সাথে তার বস্তুনিষ্ঠ দলিল **জেলাখানার দিনগুলি**তে। রানা তার এই বইটিতে বহু অজানা তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে, আকর্ষণীয় ঢং-এ, জেলজীবনের মানবিক দিকটি তুলে ধরেছেন সবার সামনে।

১৯৫৪ সালের ৩১ মে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদের ভিপি। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পরে পূর্ব পাকিস্তানে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রী পরিষদকে পাকিস্তানের বলদর্পী শাসকরা বাতিল করে দেশে ৯২-ক ধারা জারির মাধ্যমে এক নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলে বহু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ছাত্রকে তখন গ্রেফতার করা হয়। আমাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় নেয়া হয় প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের আওতায়। গ্রেফতার করা হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি এবিএম আবদুল লতিফকে,

www.nagorikpathagar.org

অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র ইশতিয়াক আহমদকে। সরদার ফজলুল করিম তখন জেলেই ছিলেন। সবার অনুরোধে আমি অঙ্গীকার করেছিলাম, জেলখানার অবস্থা সম্পর্কে লিখবো। লিখতে পারিনি। দীর্ঘ ৪৬ বছর পরে আমাদের প্রিয় ছাত্র মনোয়ার হোসেন রানা সেই কাজটি করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। লেখক একজন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মী হলেও বইটিতে রাজনীতির কথার চেয়ে দুর্গত জেলজীবনের করুন কাহিনীই প্রধান্য পেয়েছে। এ জন্যে সে ধন্যবাদের পাত্র।

আমার মনে হয়, বইটি সবার পড়া উচিত, বিশেষ করে সমাজের সচেতন নাগরিকদের এবং নীতি নির্ধারকদের, কেননা এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। কোন সভ্য মানব সমাজে এমন পরিবেশ কাংঙ্খিত নয়। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ
সাবেক উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.nagorikpathagar.org

পাঠকের প্রতি

আমি লেখক নই। গ্রন্থ রচনার উচ্চাভিলাষ কোন কালে আমার কল্পনায়ও ছিল না। জেলজীবন নিয়ে লেখাটা একেবারেই আকস্মিক। তবু পাঠকজনের প্রসন্ন হৃদয়ের কিছুটা ছোঁয়াও যদি পাই, তাও হবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। একটি বিষয় পরিষ্কার, যা লিখেছি এর কোনটাই রটনা নয়; সকলই ঘটনা। আমি দ্রষ্টা নই, দর্শক। তাই, সৃষ্টিকর্তার দেয়া চোখ দুটি দিয়ে কারাগারের চার দেয়ালের ভিতর যা দেখেছি, তার একটি সরল–সহজ চিত্রকল্প তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ কোন বোদ্ধাজনের সাহিত্যকর্ম নয়, নয় কোন ভাবালু শিল্পীর কল্পনাবিলাস–এ শুধুই একজন জেলবন্দী রাজনৈতিক কর্মীর চোখের দেখাকে লেখায় রূপান্তর করার প্রচেষ্টা মাত্র। এই লেখার মাধ্যমে নিজেকে জাহির করা, কাউকে হেয় করা কিংবা শ্রেয় করা –এর কোনটাই আমার উদ্দেশ্য নয়। সোজা কথায়, যা দেখেছি তাই লিখেছি। যা শুনেছি, তাই বলেছি। গ্রহণ, বর্জন ও বিচারের ভার পাঠকজনের।

জেলখানাকে বলা হয় অবাক পৃথিবী। এই পৃথিবী আমার কাছে পরিচিত হলেও অনেকের কাছে অপার রহস্যঘেরা। এযাবৎকাল জেলজগৎ নিয়ে লেখা বইগুলোতে ব্যক্তি–অভিজ্ঞতা ও সমকালীন রাজনৈতিক চালচিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। তাই কৌতূহলী পাঠকের কথা বিবেচনায় রেখে আমি চেষ্টা করেছি, এই অন্ধকার পৃথিবীর রহস্য উন্মোচনের। নিজস্ব বন্দীদশা ও রাজনীতিঘনিষ্ট জীবনধারা মূল্যায়নের চাইতে জেলখানার বন্দীদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন–মানের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্যের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের কোন ভুলভ্রান্তি থাকলে তার দায়ভার আমার নিজস্ব।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক রাহাত খানের কাছে। তিনি আমার এই সামান্য কাজকে সমাদর করে এর দু'চারটি অনুচ্ছেদ ইত্তেফাকের মতামতের পাতায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। কৃতজ্ঞ কবি আব্দুল হাই শিকদারের কাছে, বই হিসাবে প্রকাশের প্রথম অনুপ্রেরণা যার কাছ থেকে পাওয়া। যে সকল সহবন্দী তথ্য আহরণে সহযোগিতা করেছেন এবং অকৃত্রিম বন্ধু মিহির রঞ্জন দেব দুলাল ও অনুজপ্রতিম ফিরোজসহ যারা বই লেখার অগ্রগতির খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, বইটির প্রকাশ এদের সকলকে প্রীত করবে নিশ্চয়ই।

www.nagorikpathagar.org

জেলখানার দিনগুলি

সরকারের দুঃশাসন ও কারাগারের অনিয়মের কথা লিখে ভবিষ্যতে বন্দী জীবনের শান্তি বিনষ্ট হবে কিনা তাই নিয়ে অনেক ভেবেছি। কেবলই মনে হয়েছে, পৃথিবীতো অল্প ক'দিনের, প্রিয় হওয়ার চেয়ে সত্য হওয়ার চেষ্টা করাই ভাল। বলা বাহুল্য, আমি চোখের দেখাকে কলমের তুলিতে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছি মাত্র। এতে জেলখানার বড় বাবুরা যদি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে বিনয়ের সাথে বলি –"বিক্রমাদিত্য ভারত বর্ষ থেকে শক শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কালিদাসকে মেঘদূত লিখতে বারণ করেনি।" অকারণে কেউ জেল খাটুক, তেমনটা চাই না। তবে জেলখাটার বদনসিবের সম্ভাবনা যাদের আছে, তাদের এই বইটি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ভাল। কঠিন জেলজীবনকে সহজতর করতে বইটি সার্বক্ষণিক সহায়ক বন্ধুর কাজ দিবে।

আমার এই কথকতাকে অতিকথন ভেবে কেউ যদি ভিন্ন মতের মোড়কে বিপক্ষতা শুরু করতে চান, তাদের প্রতি সম্মান রেখেই বলব, আমার এই বাণী, "রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, রাজদ্বারে দন্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ সত্য স্বরূপ।"

মনোয়ার হোসেন রানা
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
১৯৯৯ – ২০০০ ইং

www.nagorikpathagar.org

এক

জেলখানার দিনগুলি

যারা ভাবেন, জেলখানা অন্ধকারের জগৎ, গুণ্ডা-চোর-বাটপাড় ও তস্করদের আশ্রয়স্থল, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলি-এই দেশে যখন থেকে মাতলামির জন্য তালগাছকে দোষারোপ শুরু হয়েছে এবং মাস্টার মহাশয়ের অক্ষমতার জন্য ছাত্রকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে রাখার রেওয়াজ চালু হয়েছে, তখন থেকেই ভাল-মন্দ সকল ধরনের মানুষকে কমবেশি জেলে আসতে হয় এবং হচ্ছে। জেলভীতি অনেকেরই থাকে, আমারও ছিল। ভীরু পায়ে শংকিত চিত্তে জেলখানার সদর দরজা পার হয়ে যখন ভিতরের দিকে হাঁটছিলাম তখন ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবিনি দু'দিনেই জেলের ভয়কে জয় করে নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট' বলার মতো এতটা শক্তি ও সাহস অর্জনে সমর্থ হব। জেলখানায় রাজ্যের ভাবনা এসে ভিড় করে অলস মস্তিষ্কের পরতে পরতে। নিত্যদিনের সুন্দর প্রহরগুলো চার দেয়ালের অচলায়তনে আটকা পড়ে থাকে ঠিকই, বিনিময়ে জগতের যে বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটে তাই বা কম কিসের।

কারাগারের দিনগুলো সোনার খাঁচায় না কাটলেও অ্যাডভেঞ্চার ও থ্রিলিং-এর সমন্বয়ে এ এক অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতা। কথায় বলে, "জেলখানা তো পুরুষের জন্যই"। সত্যিই জেলখানায় গতির আনন্দ না থাকলেও যতির আয়েশ আছে। চলার বেগ না থাকলেও বলার আবেগ থাকে। দিনের কর্মহীন অলস প্রহরগুলো অনায়াসেই নিরঙ্কুশ কল্পনার মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে উঠতে পারে।

জীবনের পরিসর তো আর হাজার বছর নয়। কাজেই এই অল্প পরিসর জীবনের গণ্ডিকে নিয়মের-ও পরিকল্পনার বেড়াজালে আটকিয়ে রেখে কি লাভ। আমি যুদ্ধ পছন্দ করি না, মুক্তিযুদ্ধ পছন্দ করি। মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আমন্ত্রণ না জানালেও সার্বভৌমত্বের জন্য জীবন বিসর্জনকে স্বাগত জানাই। সেই অর্থে, রাজনৈতিক কর্মীর জন্য জেলজীবন অসহনীয় হলেও অস্বাভাবিক নয়। শুনেছি, জেল না খাটলে বড় নেতা হওয়া যায় না। জেলখানা ঘুরে এসে এখন মনে হচ্ছে, জেলজীবনের এই বিচিত্র রূপ স্বচক্ষে অবলোকন না করলে পৃথিবীই দেখা হতো না। প্রকৃত অর্থেই একবার জেলখানায় পা রাখলে রাজপথে ক্লান্তিহীন পথ চলায় আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় না।

www.nagorikpathagar.org

দুই
রাজপথ থেকে থানাহাজত ঃ ডেস্টিনেশন কেন্দ্রীয় কারাগার

রমনা থানায় হাজতবাস করে থাকলে কাউকে বোধ হয় আর নরক বাসের অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন হবে না। এ এক আজব জায়গা। প্রশ্রাব-পায়খানা, ময়লা-আবর্জনা ও মানুষের এক বিচিত্র সহাবস্থান। দশ-বারো হাত জায়গার অর্ধেকটা পরিণত হয়েছে পুঁতিগন্ধময় ডাস্টবিনে। বাকি অর্ধেক জায়গায় ঠাসাঠাসি করে ৩৩ জন হাজতির অবস্থান। এক কোণে টয়লেট। জন্মের পর থেকে উহা অদ্যাবধি সুইপারের চেহারা দেখেছে বলে মনে হলো না। পয়ঃনিষ্কাশন পথ বন্ধ থাকার কারণে প্রশ্রাব-পায়খানার স্তূপ টয়লেটের সীমানা পেরিয়ে কক্ষের অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছে। মল-কীট, তেলাপোকা ও মাকড়সা মিলে অন্ধকার ভিতরটায় একটা ভুতুরে পরিবেশ তৈরী করে রেখেছে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না ঠিকই, তাই বলে জীবনের চেয়ে মলত্যাগ ও শৌচকর্মতো আর বড় নয়। হাজতে জুতা পায়ে রাখার নিয়ম নেই। তাই টয়লেটে যেতে প্রতিবারই ঈষদুষ্ণ ইঞ্চি দুই প্রশ্রাবের মধ্যে পদযুগলকে বার তিনেকের জন্য তলিয়ে যেতে হতো।

ফেব্রুয়ারীর ৯ তারিখ। ১৯৯৯ সাল। চার দফার সমর্থনে, আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদলীয় ঐক্যজোটের হরতাল চলছে। ছাত্রনেতা হাবিব-উন-নবী সোহেল, আবুল হাশেম রাজু, নাজিম উদ্দিন নাজিম ও কমিশনার চৌধুরী আলমসহ শ'তিনেক লোকের একটি মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাব হয়ে মৎস্য ভবনের দিকে যাচ্ছিলাম। জাতীয় ঈদগাহ্ ময়দানের সামনের গোলচক্কর পেরিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে পৌঁছেছি মাত্র। শুরু হলো সামনে পিছনে দু'দিক থেকে পুলিশের সাঁড়াশি আক্রমণ। আশ্রয় নিলাম হাইকোর্ট চত্বরে। সরকারের নির্দেশ চলে না যেই চত্বরে, সেই চত্বরে একজন পুলিশ কর্মকর্তার আদেশ চলবে তা ভাবিনি। যখন টের পেলাম তখন রমনা থানার ওসি রফিকের জীপ শত মাইল বেগে ধেয়ে আসছে। দৌড় শুরু করেছিলাম। কিন্তু '৯০-এর গণআন্দোলনের সাহসী সন্তান সেলিম, দেলোয়ারের গাড়ির চাকায় পিষ্ট হওয়ার ঘটনা মনে হতেই লাফিয়ে পড়লাম রাস্তা ছেড়ে হাইকোর্ট ভবনের সিঁড়ির উপর। যখন গ্রেফতার হলাম তখন সকাল দশটা। আমার সাথে গ্রেফতার হলো ঢাকা জেলার ছাত্রদলের সভাপতি ছাত্রনেতা নাজিম উদ্দিন নাজিম। গ্রেফতারের সেই কঠিন দুঃসময়ের মুহূর্তেও ওসি রফিকের গায়ের বর্ম ও মাথার হেলমেট আমার হাসির উদ্রেক করেছে বলতে হবে। জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সেকি প্রাণান্তকর চেষ্টা। যখন রমনা থানা হাজতে পৌঁছলাম তখন সকাল ১০টা ৪০ মিনিট।

www.nagorikpathagar.org

রমনা থানা হাজত। যেখানে থাকা, সেখানেই প্রস্রাব-পায়খানা, সেখানেই খাওয়া ও ঘুমানো। স্যাঁতস্যাতে, দুর্গন্ধময় আবছা আলো আঁধারির এই কক্ষটির দিকে হঠাৎ করে চোখ পড়লে মনে হবে ময়লা আবর্জনার স্তূপে কিছু শুকরছানা কিলবিল করছে। তারপরও একরাত দুইদিন ওখানটায় থাকতে হয়েছে। ডাস্টবিনে থাকা যায়। কিন্তু না খেয়ে থাকা যায় না। দু'দিন একরাতে একবারের জন্য খাবার সরবরাহ করা হলো না। অনেক বলে কয়ে খাবার পানি পাওয়া যেত। তাও দিনে এক ড্রাম। ক্ষুধার যন্ত্রণা সইতে না পেরে দ্বিতীয় দিনে মনির নামের ছেলেটি হঠাৎ করেই লোহার গেট ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার শুরু করল। কিছুক্ষণ পরেই কর্তব্যরত কর্মকর্তা হাজত খুলে চোখ বেঁধে ছেলেটিকে নিয়ে গেল নির্যাতন কক্ষে। এরপরে মাইরের ডরে ক্ষুধার যন্ত্রণাকে সকলেই হজম করে গিয়েছে। এমন অমানবিক আচরণ বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। ক্ষুধা, পিপাসা ও ক্লান্তি নামক অসুবিধাগুলো ঘুমের মধ্য দিয়ে পরাস্ত করব ভেবেছিলাম। অনেক চেষ্টা তদবির করেও মাথা রাখবার স্থান সংগ্রহ করা গেল না। রবিঠাকুর বলেছেন, "বহু দিন মনে ছিল আশা, রহিব আপন মনে, ধরণীর এক কোণে, ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা"। আমার মনে হয় কবিকে হয়তো এই বাংলার কোন থানা হাজতে আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল।

নিত্যদিন ক্যাম্পাসে যে পুলিশ কর্মকর্তার সাথে দেখা হয়, গ্রেফতারের দিন সকাল অবধি যার সাথে মধুর ক্যান্টিনে স্বাভাবিক বাক্যালাপ হলো, সেই পুলিশ কর্মকর্তাই হাইকোর্ট চত্বর থেকে মুরগীর ছানার মতো খপ করে ধরে এনে হাজতে ফেলে রাখল। দু'দিনে একবার দেখা পর্যন্ত করার প্রয়োজন বোধ করল না। একই বস্তু কেমন করে শুধুমাত্র সময় ও পরিবেশ ভেদে শ্লীল ও অশ্লীল হয়ে উঠতে পারে–ওসি রফিক তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এসব দিক সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করলে ভাবতেও কষ্ট লাগে যে, পুলিশ কোন বাবা-মায়ের সন্তান বা নিজেরাই কোন সন্তান-সন্ততির মা-বাপ। মানুষই পুলিশ হয় বটে, কিন্তু পুলিশ হলে তারা বোধ হয় আর মানুষ থাকে না। রমনা থানা হাজতের টয়লেটের দরজার উপরে মাটির আঁচড়ে লেখা রয়েছে, "আমার ছেলেকে মানুষ নয়, পুলিশ বানাইব"। ক্ষোভে-দুঃখে ম্রিয়মান, নির্যাতন, অত্যাচারে অতিষ্ঠ কোন হাজতি বাবা তার সন্তানকে মানুষ না বানাইয়া পুলিশ বানানোর এহেন আক্রোশ পুলিশের অধঃপতিত অবস্থানেরই ইঙ্গিত বহন করে। মওলভী ফরিদ আহমদ তাঁর 'কারাগারের সাতাইশ দিন' বইতে পুলিশের এহেন আচরণ সম্পর্কে বলেছেন, "পুলিশ হচ্ছে ঘটিয়া ডিপার্টমেন্ট। এরা সবকিছুতেই দোষ দেখতে পায়। তাছাড়া নিজের কর্তব্যের সীমা কত খানি বুঝতে না পেরে প্রায়ই সীমা লঙ্ঘন করে।"

www.nagorikpathagar.org

মেয়েটির নাম বিউটি। অষ্টাদশী এবং রূপসী। শুনেছি, ছয়দিন থেকে থানা হাজতে আছে। ভালই ছিল কিন্তু হরতালের সুবাদে হাজত কক্ষ ভরে উঠায় ওর স্থান হয়েছে লকআপের সামনের খালি জায়গাটিতে। তরুণীটি চলনে বলনে স্মার্ট। বেশভূষায়ও মন্দ নয়। কি কর্ম করে থানায় এলো কেবল সেটাই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু একটা কথা আজ স্বীকার করতে হবে, মেয়েটি না থাকলে আমাদের আরও অসুবিধা হতে পারত। ওর বেলায় পুলিশী নজরদারী কম ছিল। কাজেই ওর মাধ্যমে সিগারেট ও খাবার জলের কিছুটা হলেও একটা গতি করা সম্ভব হয়েছিল। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম–মেয়েটি আমাদের সেবাযত্নের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, বিউটির দেয়া কলা আর পাউরুটি অমৃতজ্ঞান করে ভক্ষণ করতে হয়েছিল। কামনা করি, মহান সৃষ্টিকর্তা ওর মঙ্গল করুক। তবে আরেকটা কথা না বললেই নয়, হাজতের কঠিন দুঃসময়েও ওই অষ্টাদশীর উপস্থিতি ক্ষণিকের জন্য হলেও হাজতী তরুণদের মাঝে খানিকটা রোমান্টিক অনুভূতির সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কারণে–অকারণে বহুবার বলতে শুনেছি "এই বিউটি আপা শোনেন"। একগাল মিষ্টি হেসে লকআপের সামনে দাঁড়িয়ে বিউটির প্রতি উত্তর–"কিছু লাগব?"। আইনের জ্ঞান আমার নেই। তাই বিউটিরা কোন আইনে দিনের পর দিন থানা হাজতে বিহার করছে তার ব্যাখ্যা দেয়া আমার সাধ্যাতীত। সামাজিক নিয়ম ধরে রাখার দায়িত্ব যেই পুলিশের তাদের কারণে সমাজের স্বাস্থ্য দূষিত হলে পুরো সামাজিক অবকাঠামোই ভেঙ্গে পড়তে পারে। কোর্টের বারান্দার ধর্ষিতা ৫ বছরের তানিয়া জাতির ললাটে সেই কলংকের তিলকই এঁকে দিয়ে গেছে।

দু'দিন জীবনপণ সংগ্রাম শেষে ১০ই ফেব্রুয়ারী বিকাল ৫টায় যখন কোর্টের উদ্দেশ্যে প্রিজনভ্যানে উঠলাম, তখন হাজতবাস শেষ হয়েছে ভেবেই চিত্ত উদ্বেলিত। ঘন্টাখানেক পরে পুরান ঢাকার কোর্ট গারদে পৌঁছলাম। সে আরেক বিচ্ছিরি জায়গা। নিকৃষ্ট জায়গা হলেও থানা হাজতের চেয়ে উৎকৃষ্ট বলতে হবে। ভেড়ার পালের মতো ঠাসাঠাসি করে স্থান সংকুলান করা হলো। পাঁচশত টাকা সেলামির জোরে ১০ মিনিটের মধ্যে আমার ও নাজিমের ভি.আই.পি কক্ষে থাকার ব্যবস্থা হলো। আত্মীয়–স্বজন আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। ভিতরে আসতে পারছিল না। আরও শ'তিনেক টাকা নজরানা ধরিয়ে দিতেই মুহূর্তের মধ্যে আমার আত্মীয়রা পুলিশের পরমাত্মীয়ে পরিণত হয়ে গেল। শুনেছি, মানুষের মন ও আকাশের রঙ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, কারণে–অকারণে বদলায়। কিন্তু উপযুক্ত বকশিশে পুলিশের রঙ ও মন পরিবর্তনের এহেন দ্রুততর প্রক্রিয়া চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

রাত ১২টায় জেলখানার উদ্দেশ্যে আবার প্রিজনভ্যানে আরোহণ। এতোটুকু ভ্যানে ৫০ জন আসামী। নর্থ বেঙ্গলের গরুর পাইকারদের ট্রাকে গরু ভরার সময় যতটুকু গরুপ্রীতি থাকে, প্রিজনভ্যানে আসামী ভরার ক্ষেত্রে ততটুকু মানবপ্রীতিও লক্ষ্য করা গেল না। অর্ধবৃত্তকারে পিতলের অক্ষরে লেখা "ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার"–এর সদর দরজায় যখন পৌঁছলাম তখন রাত্রির প্রথম প্রহর।

আমার দ্বিতীয় কারাবাসের কালে থানা হাজতের দুর্গতি কিছুটা সহনীয় হলেও আওয়ামী পুলিশের অবর্ণনীয় দুঃসহ নির্যাতনের কথা মনে হলে এখনও শরীর শিউরে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন। মনীষী অমর্ত্য সেনকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রী দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কদিন বাদে শোনা গেল সরকার প্রধান শেখ হাসিনাকেও ওই দিনে ডক্টরেট উপাধি দেয়ার আয়োজন চলছে। আমাদের আপত্তিটা ছিল ওখানেই। সুশীল সমাজ স্পষ্টতঃই বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বড় অংশ এহেন সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারলেন না। প্রতিষ্ঠানের সাবেক ছাত্র হিসাবে সরকার প্রধানকে সম্মান প্রদানের রেওয়াজ হয়তো আছে। কিন্তু শেখ হাসিনাকে যে বিষয়ের উপর ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়ার আয়োজন হলো তা ছিল নিতান্তই অর্বাচীন ও তোষামোদী সিদ্ধান্ত। আওয়ামী শিক্ষক ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের প্রায় সকলেই এই কনভোকেশন বয়কট করলেন। আমাদের সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সিদ্ধান্ত নিল প্রতিহতকরণের। কনভোকেশনের দিন হরতাল ডাকা হলো। হরতাল সফল করার লক্ষ্যে আগের দিন বিকেলে ৪টায় শুরু হলো বিএনপি অফিস থেকে প্রচার মিছিল।

ঝাঁঝালো টিয়ার গ্যাসের তীব্র যন্ত্রণা, রাবার বুলেট, রায়টকারের বীভৎস সাইরেন এবং অহরহ বোমা বিস্ফোরণের ধোঁয়াটে পরিবেশের মধ্য দিয়ে জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো যখন পুলিশের হাতে ধরা পড়লাম তখন বিকেল ৪টা ১০ মিনিট, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৯। এমন একটা আগুনঝরা উত্তপ্ত মুহূর্তে দলীয় কার্যালয়ের উল্টোপার্শ্বে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কেবলই মনে হচ্ছিল এবারের কারাবাসটা বুঝি নিঃসঙ্গ হবে। মিনিট পাঁচেক পর কোরবানীর হাটের ছাগলের মতো টানাহেঁচড়া করে পূর্ব পার্শ্বের গলির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। ওখানটায় যা দেখলাম, তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য, বীভৎস ও ভয়ংকর। আমার হাত দুই সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক

www.nagorikpathagar.org

নাসির উদ্দিন পিন্টু। আমার স্মৃতি যদি নিজের সাথে প্রতারণা না করে তা'হলে নিশ্চিত করে বলতে পারি, এ দৃশ্যটি ছিল বড়ই অমানবিক। নাক দিয়ে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছে। গতরের রক্তমাখা গেঞ্জিটি ছিঁড়ে খানিকটা বাঁ-দিকে ঝুলছে। আঘাতে সিনার একপাশ কাত হয়ে পড় পড় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। আপাদমস্তক থরথর করে কাঁপছে। একজন কর্মকর্তাকে দেখলাম ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে ব্যাপক যোগাযোগের চেষ্টা করছে তড়িঘড়ি করে প্রিজনভ্যান আনানোর জন্য। এরই মধ্যে পিছন থেকে হ্যাঁচকা টানে আমাকে নাসির উদ্দিন পিন্টুর কাছে নিয়ে দুজনকে যৌথ হ্যান্ডকাপে বেঁধে ফেলা হলো। আসলে পুলিশ কনস্টেবলদের লাথি-গুঁতা, লাঠিপেটা ও অশ্রাব্য গালাগালির চোটে নেতিয়ে গিয়েছিলাম বটে, তবে পিন্টু ভাইয়ের বেহাল অবস্থা দেখে নিজের হালহকিকত বুঝে উঠার ফুরসৎই পেলাম না। প্রিজনভ্যানে করে মিনেট পাঁচেক পর আমরা যেখানে উপস্থিত হলাম, বুঝতে অসুবিধা হলো না এর নাম মতিঝিল থানা। ডিউটি অফিসার পূর্ব পরিচিত থাকায় আদর নয়, কিছুটা অনাদারের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। নামধাম লেখা শেষ করে লকআপের সামনে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম, স্যাঁতস্যাতে পুঁতিগন্ধময় মেঝেতে খালি গায়ে নানা জায়গায় থেতলানো রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে ছাত্রদলের সভাপতি হাবিব-উন-নবী সোহেল। অতি কষ্টে মাথা উঁচু করে অমিত সাহসের সুরে বলে উঠলো-"আসো রানা, আসো। ভয় নাই, জয় আমাদের হবেই"।

www.nagorikpathagar.org

তিন

আমদানির পয়লা রাত ও ঐতিহাসিক ইলিশ ফাইল

জেলের প্রধান ফটক পার হয়ে মূল ক্যাম্পসে পা রাখতেই হাতের ডানে চোখে পড়ল তাজমহলের মনোরম প্রতিকৃতি। কথিত আছে, ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত পিতা-পুত্র প্রথানুযায়ী মৃত্যুর পূর্বে তাদের শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগে একরাতে এই শিল্পকর্মটি তৈরী করেন। মননশীল এই শিল্পকর্ম কর্তৃপক্ষকে অভিভূত করে। শুরু হয় শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ উদ্যোগ। প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমায় পিতা-পুত্রের মুক্তি ঘোষণা করা হলো। খুশির সংবাদে আত্মহারা বৃদ্ধ পিতা নিজের সৃষ্ট শিল্পকর্মের বেদিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মুক্তির সনদ ও পিতার লাশের কফিন সাথে নিয়ে জেল চত্বরের বাইরে পা রাখল রূপকথার অজানা তরুণ।

মেইন গেট থেকে সামনে যেতেই হাতের ডানে আমদানি। জেলে আসলে সকলকেই এক রাতের জন্য আমদানিতে থাকতে হয়। এটি একটি বিশাল হলঘর। হাজার দেড়েক লোক থাকতে পারে অনায়াসে। এক পার্শ্বে ময়লা কম্বলের স্তূপ। অন্য প্রান্তে টয়লেট। আমদানির পাহারার দায়িত্ব রয়েছে কয়েদি তারামিয়া। আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সর্দার। অসুরাকৃতির ঢাউস দেহ, বেঢপ চেহারা, আগুনের হলকার মতো চোখ, তিরিক্ষি মার্কা মেজাজ। গঞ্জিকা সেবনের আধিক্যে গায়ের মাংস লোপ পেয়ে হাড্ডি সর্বস্বে পরিণত হয়েছে। আমার কৌতূহল হলো। জেল পুলিশের বদলে কয়েদিদের কেন এহেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রাখা হয়েছে। কদ্দিনেই বুঝতে পারলাম, বৃটিশ রাজ্যের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা অনেককাল আগে বিলুপ্ত হলেও জেলখানাগুলো ঔপনিবেশিক প্রভুদের নমুনা পবিত্র জ্ঞান করে অব্যাহত রেখেছে।

লঞ্চের ভেঁপুর মতো হেঁড়ে গলায় তারামিয়ার তীব্র চিৎকার-"ফাইল, ফাইল"। তৎক্ষণাৎ শুরু হয় গেল তারামিয়ার সহযোগীদের চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুষি, লাথি-গুঁতা ও কঞ্চির সপাং সপাং বাড়ি। তড়িতাহতের মতো চার কলামে সারিবদ্ধভাবে বসে গেলাম। এরপর শুরু হয়ে গেল গণনার পালা। জেলের ভাষায় গুনতি। গুনতি না মিললে যত যন্ত্রণা। গুনতি মিলতেই আবারও তারামিয়ার হেঁড়ে গলায় চিৎকার-জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণটা দে তো। সহযোগী মুহসীন তোতা পাখির মতো বাঁধাগৎ বলতে শুরু করল-"যদি লগে ট্যাকা-পয়সা, ঘড়ি-চেইন, নেশার গাঞ্জা-ভাং থাকে, অখ্যন জমা দিয়া দ্যান। পরে চেক কইরা পাইলে কিন্তু হাড্ডি গুঁড়া কইরা ফালামু। সাবধান! রাতে কুত্তা ঢুকে জুতা চুরি করনের লাইগ্যা। সকালে যদি কেউ কয় আমার জুতা নাই, তাইলে এই যে কঞ্চি দেখছস্-বাইড়াইয়া পাছার ছাল তুইল্যা ফালামু"।

www.nagorikpathagar.org

জেল কোডে নিষিদ্ধ কোন জিনিস আমদানিতে সাথে না রাখাই ভাল। নগদ টাকা থাকলেও মেইন গেটে পারসোনাল একাউন্টে জমা করে দিবেন। জেলের ভাষায় যাকে বলে পিসি। কোন অবস্থায়ই পয়লা রাতে টাকা-পয়সা লেনদেন করবেন না। কদ্দিন বাদে লেনদেনের ব্যবস্থাটা নিজেই বুঝে উঠতে পারবেন। পিসি'র দোকান বসে শুক্রবার। দশ টাকার মাল পনের টাকা। শুধুমাত্র সওদা করার নিমিত্তে ভিজিটরস কাউন্টারে কুস্তি লড়ার চেয়ে বিশ-ত্রিশ পারসেন্ট চড়া দামে পিসিতে সওদা করাই ভাল।

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ শেষ, গুনতিও শেষ। মনে হলো কষ্টক্লিষ্ট মানুষগুলোর এবার ঘুমের মওকা মিলবে। আমাদেরকে লাইনে বসিয়ে রেখে তারামিয়া ও তার গ্যাং ঘরের এক কোণায় কি যেন কানাঘুষা করে নিল। শুরু হলো তল্লাশী অভিযান। কোথা হতে কি হলো বুঝে উঠতে পারলাম না। শুধু দেখলাম, হায়েনার দলের হরিণ শিকারের মতো তারামিয়ার দলবল আঠার/বিশ বছরের একটি যুবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উড়া-ধুরা কঞ্চির বাড়ি, কিল-ঘুষি। টেনে হিঁচড়ে ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়া হল কোণায় বসা তারামিয়ার কাছে। প্রথমে গোটা দুই লাথি। অপরাধ! ছেলেটির গলায় সোনার মালা পাওয়া গেছে। পরে শুনেছি, ঐ আজগুবি মাইরটা মালা রাখবার অপরাধে নয়, মালাটির স্বত্ব ত্যাগ করানোর অপকৌশল মাত্র। বালক ফরিদ ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবেনি, গলার মালা এমন করে প্রাণের জ্বালা হয়ে উঠতে পারে।

রাবণের বাণ সহ্য হয়, হনুমানের দাঁত খিঁচুনী সহ্য হয় না। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নিয়ন্ত্রিত হতে নয়, নিয়ন্তা হতে অভ্যস্ত। অধিকারের প্রশ্নে গলা উঁচিয়ে কথা বলাটাই অভ্যাস। জীবনে এই পয়লা বার উৎকণ্ঠিত ও উদগ্রীব চিত্তে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলাম এরপরে কি ঘটে তা দেখার জন্য।

ঐ বাজখাঁই মার্কা ভয়ঙ্কর লোকটির সাথে কথা বলার অহেতুক একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসল। নিজের পরিচয় দিতেই কিছুটা শীতল মনে হলো। বিশ্বাস করতেও কষ্ট হলো-এমন ভীতিকর মানুষের মধ্যে আবেগ-উচ্ছ্বাস থাকতে পারে। তারামিয়ার কথাগুলো আমার জীবনভর মনে থাকবে-"আমি তো ভাই মরা মানুষ। জিন্দা লাশ। আমার লগে কথা কইয়া কি অইব"। ওর সাথে আলাপ করে অনুমান হলো-সাত হাজার আসামীর এই জেলখানাটা টিকে আছে মিয়াসাহেব নামের আধমরা সিপাইদের তিনহাত লম্বা লাঠির জোরে নয় তারামিয়াদের পয়লা রাতের ভীতির ডরে।

জেলখাটিয়ে বন্ধুদের কাছে ঐতিহাসিক 'ইলিশ ফাইলের' গল্প শুনেছি। আজ স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হলো। সমুদ্রে ইলিশ শিকারী ট্রলারে ছোট ছোট খোপে লক্ষ লক্ষ ইলিশ মাছ গুদামজাত করার দৃশ্য যারা দেখেছেন তারা অনুমান করতে পারবেন-তারামিয়ার মানুষ ফাইলের সেকি বীভৎস রূপ।

www.nagorikpathagar.org

একশ বিয়াল্লিশ জন আসামীর জন্য বরাদ্দ গুটিকয়েক কম্বল। জনপ্রতি একফুট জায়গা। হুকুম হতেই হেলপার চারজন তর্জনগর্জন করে, একজন করে আসামী চ্যাংদোলা করে ধরে এনে কাত করে ফেলেই হাঁটু ভেঙে দু'পায়ের ফাঁকে আটকে রাখে আর হাতের কঞ্চি দিয়ে পিঠের উপর কষে বাড়ি মেরেই কমন ডায়লগ "চাপ শালা"। ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া আসামীরা জড়সড় হয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে রইল। শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবেন তাই সয়। এই অবস্থার মধ্যেও অনেককে নাক ডেকে ঘুমোতে দেখেছি। বিবেক বিব্রত হলেও আমার ক্লান্ত শরীর মহাশয় জন–গণ–মন হতে পারল না। সহবন্দী নাজিমের প্রচেষ্টায় এক প্যাকেট বেনসন সিগারেটের সুবাদে আয়েশ করে সহি–সালামতে আলাদা বিছানায় শোয়ার জায়গা হলো। শুধু ভাবি, ঐ এক প্যাকেট সিগারেট কাছে না থাকলে সেদিন কি–ই–না হতে পারত।

জীবনের এই অল্প পরিসরে বিচিত্র ভারতবর্ষের দার্জিলিং থেকে উটকামণ্ড হয়ে তাজমহল, বৃন্দাবন ও আন্দামান ঘুরে দেখেছি। এভারেস্টের দেশ নেপাল হয়ে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে উড়ন্ত মেঘের ছোঁয়ার শিহরণ গ্রহণ করেছি। আধুনিক শহর ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, অকল্যান্ড, সিডনি হয়ে জাপানের টোকিও থেকে কোবে সিটি পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছি। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপমালা হয়ে শ্রীলংকার বেনটোটা সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ করেছি। দ্বীপান্তরিত নেলসন ম্যান্ডেলার রবিন আইল্যান্ড, সাগর সংগমস্থল কেপ পয়েন্ট ও তাঞ্জানিয়ায় আফ্রিকার Safe forest-এর বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। তারপরও যদি কেউ প্রশ্ন করেন, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি–জীবনের সুন্দর দর্শনের এতোসব অভিজ্ঞতার চেয়ে ঢাকা জেলের আমদানির সেই রাতে ঐ আস্ত কম্বলের বিছানাটি ছিল আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয়।

যখন বিছানায় গা লাগানোর সুযোগ হলো তখন রাত ২টা। রাজ্যের প্রশান্তি এসে ধরা দিল শ্রান্ত শরীরে। চোখ বুঝতেই কবি জীবনানন্দের অন্তহীন ভাবনা এসে অলস মনে ধরা দিল–"বিছানার মুখ দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর রূপ দেখিতে চাই না আর"। এরই মধ্যে এক লোক মাথা উঁচু করে নিচু গলায় বলল–"ভাই একটু বাথরুমে যাওন লাগব।" ওরে বাবা! তারা-মিয়ার সহযোগীরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। একলাফে লোকটির সিনার উপর উঠে বসল। পশ্চাতদেশে মধ্যে গোটা দুই কঞ্চির বাড়ি দিয়ে বলে উঠল–"শালা, কল্লা হুতা"। মজার ব্যাপার হলো, ইলিশ ফাইল থেকে উঠে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে দু'দিক থেকে চেপে এসে জায়গা দখল হয়ে যায়। আর এর জন্য শাস্তি সারারাত জেগে দাঁড়িয়ে থাকা। কাজেই প্রকৃতির ডাককে উপেক্ষা করে, সমস্ত কষ্ট-বেদনাকে কপালের লিখন মনে করে গুটিশুটি হয়ে সকালের অপেক্ষায় পড়ে রইলাম। হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ চলে গেল। শুরু হলো তারামিয়ার গলা খ্যাঁকরানি, "এই ঐখানে উঠলো কে রে?" অনুমান হলো, অন্ধকারে ভীতি

www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শনের জন্য ফাঁকা বুলি ছাড়ছে। তবে পাদুকা জোড়া বুকের কাছে নিয়ে ঘুমানোর এহেন প্রক্রিয়া বড়ই নির্মম। পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম টেরই পাইনি। তবে অনুভব করলাম, ঘুমের ঘোরে পার্শ্বের বিছানায় তারামিয়া ও তার সহযোগীরা রাতের নগদ প্রাপ্তির হিসাব-নিকাশ করছে। সিগারেট দশ প্যাকেট, নগদ বায়ান্ন টাকা, সোনার চেইন একটি। নগদ প্রাপ্তি তেমন না হলেও সোনার চেইনটা ওদের পরিতৃপ্ত করেছে বোঝা গেল। অন্ততঃ ওদের আয়েশী গঞ্জিকা সেবনের দৃশ্য দেখে তাই মনে হচ্ছিল।

রাত চারটা। ঘুমের ঘোরে শুনতে পেলাম-"ফাইল, ফাইল"। ভাবলাম একটু পরে উঠব। মাইরের ডরে সাহস হলো না। বাথরুমের দিকে যারা যাচ্ছিল, তাদেরকে ভেড়ার পালের মতো লাঠিপেটা করে ফাইলে বসানো হলো। প্রকৃতির ডাককে উপেক্ষা করে অনেক কষ্টে ফাইলে বসলাম। গুনতি শেষে বারান্দায় দাঁড়িয়েছি মাত্র। আবার শ্রুতিকটু বাক্য-"ফাইল, ফাইল"। শুরু হলো বাধ্যতামূলক চুল ছাঁটাই পর্ব। সেও এক মজার ব্যাপার। ত্বরিৎকর্মা নাপিত। লাইনের শেষ প্রান্ত থেকে কাঁচি চালাতে চালাতে চক্ষের নিমিষে পৌঁছে গেল পয়লা প্রান্তে। চুল কাটা শেষ। ইতর-ভদ্র, ফকির-বাদশাহ সকলের জন্য একই স্টাইল, একই ডিজাইন-বাটি ছাঁট। শৈশবে গ্রামের বাড়ীতে গাছ-তলায় বসে চুল ছাঁটাইয়ের সময় বুদ্ধু নাপিতের বাটি ছাঁট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাবার দৃষ্টির আড়ালে বুদ্ধু চাচাকে কতো অনুনয়-বিনয়ই না করেছি। মাল ঢাললে এবড়ো থেবড়ো চুল কেটে নেয়ার অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা এখানেও আছে। তবে জেলখানায় দাক্ষিণ্যের স্থান না থাকলেও দক্ষিণার প্রভাব প্রকট। অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই ফাইলিং এর সময় প্রতিবার লাইনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে আত্মসম্মান রক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

অকারণে কেউ জেল খাটুক, এমনটা কামনা করি না। তবে জেলখানায় আসার সম্ভাবনা যাদের আছে, তাদের আমদানি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ভাল। এত কথা বলার উদ্দেশ্যে একটাই, জেলে আসতে, গেইটের ভেতর পা রাখার আগেই ইলিশ ফাইলের কথা ভেবে গোটা কয়েক সিগারেটের প্যাকেট সাথে আনতে কেউ যেন ভুল না করেন। কারণ, সিগারেটকে বলা হয় জেল কারেন্সি। জেলে হেন কাজ নেই যা সিগারেটে হয় না। তবে, কথা কি জানেন, আমার দ্বিতীয় কারাবাসের সময় ঐ একই ভুল আমার আবারও হয়েছে। থানা হাজত ও কোর্ট গারদের দুর্বিসহ সময়ে জেলখানার আগাম দুর্গতির কথা ভেবে সিগারেটের যোগান রাখার ভাবনার সুযোগই বা কোথায়।

www.nagorikpathagar.org

চার
পাচাঁনীদের দুর্গতি ও কেইস টেবিল সমাচার

আমদানির সামনে শান–বাঁধানো জায়গায় ফাইল করে, কিশোর বন্দী ও পাঁচানী মামলার আসামীদের আলাদাকরণ প্রক্রিয়াটি বড়ই অদ্ভুত। তখন মাঝরাত, বিজলী বাতির অপর্যাপ্ত আলো। মিয়াসাহেবরা (জেল সিপাই) ঘুরে ঘুরে সাইজে ছোট আসামীদের বাছাই করে আলাদা করছে। সিআইডি মিয়াসাহেব বাছাইকৃত ছেলেদের নাকের ডগার নিচে আঙুল চালনা করে দাড়ি–গোঁফের অস্তিত্ব অনুসারে মেন্টালে না স্কুলে পাঠানো হবে তার হুকুম জারি করছে। পড়ুয়া বালকদের জন্য স্কুল ওয়ার্ড, ঠিকই আছে। কিন্তু কিশোরদের ওয়ার্ডটির নাম মেন্টাল ওয়ার্ড কেন হলো তা বুঝে উঠতে পারলাম না।

পাঁচানী মামলা। শব্দ দু'টি আইনের বইয়ে আছে কিনা জানি না। তবে থানা-পুলিশ, আদালত চত্বর এবং জেল-হাজতে বহুল পরিচিত। জেলের সুইপাররা পর্যন্ত পাঁচানীদের সাথে কথা বলার সময় নিজেদেরকে মিঃ জেলার ভাবতে শুরু করেন। পাঁচানীদের জন্য বিচার ব্যবস্থাও অদ্ভুত। আদালত মুলতবি হলে কোর্ট হাজতের বারান্দায় এদের দরবার বসে। এদের দণ্ড হয় আদম–সুরৎ বিবেচনায়, অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে নয়। সাজার প্রকৃতি, নগদ জরিমানা–দু'শ থেকে তিনশ টাকা। অনাদায়ে দু'চার দিনের কারাবাস। তবে দণ্ডাদেশের হিসাব ধরা হয় থানা হাজত থেকে। পাঁচানীদের জন্য বিচারকের সশ্রমাদেশ না থাকলেও জেলাশ্রমে এদের দণ্ডাশ্রমের মেজবানীটা বড়ই মর্মন্তুদ। "সকলের চেয়ে কম পরে কম খেয়ে তারা সকলের পরিচর্যা করে। সকলের চেয়ে বেশি পরিশ্রম সকলের চেয়ে বেশি অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোস করে, উপর–ওয়ালাদের লাথি–ঝাঁটা খেয়ে মরে"। যেতে আসতে চলতে ফিরতে খামাখা লাথি–গুঁতার এই প্রয়োজনীয়তা আমার বোধগম্য হলো না। খুব সম্ভবত কর্মকর্তারা জেলকোডে কি আছে তা বুঝতে চান না বা কর্মচারীদেরকে বোঝাতে চান না। না-হক কাজের এই বেসাতি অনেককাল চলবে বলেই মনে হলো। মনের দুঃখে এক পাঁচানীকে বলতে শুনেছি, "পাঁচানী মামলায় হাজতবাসের চাইতে যাবজ্জীবন কারাবাসও ভাল, এতো কষ্ট জীবন নষ্ট।" পুলিশকে উপযুক্ত ঘুষ দিয়ে অনেককেই মামলা পাঁচানীতে রূপান্তরিত করতে দেখেছি। রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য বলি, পয়সা দিয়ে এহেন অসম্মানের পথ চলার চাইতে বীরোচিত জেলজীবনও ভাল। পাঁচানী মামলাটা

www.nagorikpathagar.org

আসলে কি সেই কৌতূহলটা আমার রয়েই গেল। পরে দশ নম্বর সেলে আমার পাশের কক্ষের বউ মার্ডার কেইসের আসামী এডভোকেট সেলিম নেওয়াজ চৌধুরীর কাছ থেকে জেনেছি পাঁচানী হলো DMP ACT-1, অনেকটা সন্দেহভাজন আইন ৫৪ ধারার মতো। হুদাহুদি কাউকে দু'চারদিন জেল-হাজতে রাখতে এ আইনের কোন জুড়ি নেই। ক্ষমতা এবং যৌবনী শক্তির জোরে যে সকল কর্মকর্তা ও কয়েদিরা জেলখানাটিকে একটি নির্যাতনের আখড়ায় পরিণত করেছেন, বয়সের ভারে এক সময় তারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন, "এই বদ্ধভূমিও স্বদেশ ছিল"।

আমরা বন্দীর সংখ্যা একশত বিয়াল্লিশ জন। এর মধ্যে শ'খানেকের বয়স বিশ বছরের নিচে। বিশজনের বয়স বারো বছরেরও কম। আমার একটা জিনিস বোধগম্য হলো না-পুলিশের মধ্যে হঠাৎ এই ছেলে ধরার প্রকোপ কেন সংক্রমিত হলো। আলাপচারিতায় জেনেছি, বিল্লা ও নসু সদরঘাট টার্মিনালে নেমে হেঁটে হেঁটে মগবাজার যাচ্ছিল। পল্টন মোড়ে বি.এন.পি ও আওয়ামী লীগের মিছিলের মুখোমুখি সংঘর্ষ দেখে আশ্রয় নিয়েছিল মুক্তাঙ্গনে, পুলিশ ভ্যানের পাশে। হাঙ্গামা থামতেই পুলিশ ক্ষিপ্র গতিতে ওদের ভ্যানে তুলে নিল এবং ব্যাপক তৎপরতার সাথে ওয়ারলেস করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিল, "স্যার এক্কেবারে হাতে-নাতে দুইজন ধরেছি"। মনির মৌচাকের ঘড়ির দোকানের কর্মচারী। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হরতালের মিছিল দেখছিল। হঠাৎ একটি পুলিশ ভ্যান ওর পাশে এসে থামল। মনিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে মোড়ে কিছুক্ষণ আগে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে সেই অপরাধে। সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের পুকুরে গোসল করছিল চারজন নির্মাণ শ্রমিক। ওদেরকে পুকুর থেকে তুলে শাহ্‌বাগে বোমা নিক্ষেপের মামলার আসামী করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষের জের হিসাবে আধ ঘণ্টা পর শাহ্‌বাগের মানিক নামের ছেলেটিকে ধরা হয়েছে আর্ট ইনস্টিটিউটের সামনে থেকে। এই গ্রেফতার যে অপরাধ দমনে পুলিশের পারঙ্গমতা প্রকাশের জন্য নয়, তা আর কারও বুঝতে বাকি রইল না। পরের দিন পত্রিকায় নিউজ হতে পারে এই ভেবে ঘটনাস্থল-ওয়ারী এই গ্রেফতারী আত্ম-প্রবঞ্চণা পুলিশের নষ্ট মানসিকতাকেই প্রকাশ করে। আন্দাজের উপর এ জাতীয় গণগ্রেফতার মূলতঃ দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচীকে সামনে রেখে হয়ে থাকে। এদের প্রায় সকলকেই পাঁচানী মামলায় চালান করা হয়। এতে পুলিশের কার্যসিদ্ধি হয়; বন্দীদেরও অল্পেতে মুক্তি মিলে। কাজের কাজ হয় না কিছুই।

www.nagorikpathagar.org

আমদানির বারান্দায় পশ্চিম প্রান্তে লেখা রয়েছে 'কেইস টেবিল'। কেইস টেবিল হলো জেলখানার অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত বিচারের এজলাস। তবে আয়োজনটা মোঘল সম্রাটদের দরবারে মজলিস স্টাইলের। মারামারি, অনিয়ন্ত্রিত চলাচল, নিষিদ্ধদ্রব্য বহনসহ জেলকোড ভংগের অপরাধ থাকলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে putup করা হয় কেইস টেবিলে। জেলের ভাষায়, 'কেস্টো ফাইল' অথবা 'কেস্টা ফাইল।' পার্শ্বের দেয়ালে কালো রঙের টিনের প্লেটে সাদা কালিতে লেখা রয়েছে-"জেলখানায় কেউ টাকা-পয়সা লেনদেন করবেন না।" ভাগ্য ভালো, ঐ লেখাটি পয়লা দিন আমার নজরে পড়েনি। ওদের ঐ লেখাটি মেনে চলতে গেলে কত দুর্ভোগই না আমাকে পোহাতে হতো। কি নির্মম পরিহাস। সিগারেটের বিজ্ঞাপনের সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ নোটিশের মতো ওদের লেখার কাজ ওরা লিখে রেখেছে। এতে আরাম-আয়েশে থাকবার জন্য ঘুষ দেয়া-নেয়ার কমতি হচ্ছে বলে মনে হলো না। বলা যায়, নিয়মের বিধান রক্ষার এই টেবিলটিই জেলখানার সকল অনিয়মের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

কেইস টেবিলের দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েদিদের বলে রাইটার। রাইটার শব্দের মানে করা দুষ্কর। তবে অক্ষর জ্ঞান অত্যাবশ্যক এমন কাজের দায়িত্বে থাকা কয়েদিদের রাইটার বলা যেতে পারে। চেহারা দেখে মনে হলো-ওদেরকে ওখানে দায়িত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার পাশাপাশি সৌন্দর্যের বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছে। ওখানেই দেখা হলো জেলের চীফ রাইটার আনিসের সাথে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমার এলাকায় বাড়ি। সাবেক ছাত্রনেতা। এক নজর দেখেই বোঝা যায়-হাজারো কয়েদিদের মধ্যে থেকে চীফ রাইটার হওয়ার মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ওর আছে। ভীষণভাবে কো-অপারেটিভ। শ্রেণীভেদ জ্ঞান আছে। দক্ষিণা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আত্মসম্মানবোধকে এখনো পুরোপুরি বিসর্জন দেয়নি। নিশ্চিত করে বলতে পারি, সেদিন আনিস না থাকলে চোর-বাটপাড়দের একই সারিতে বসে, বাটি ছাঁটের পাল্লায় পড়ে সাধের কেশগুচ্ছকে বিসর্জন দিতে হতো। সইতে হতো নানা লাঞ্ছনা। কামনা করি, ওর মঙ্গল হোক।

কেইস টেবিল নিয়ন্ত্রিত পিসি'র দোকান বসে শুক্রবার। দশ টাকার মাল পনের টাকা। শুধুমাত্র সওদা করার নিমিত্তে ভিজিটরস কাউন্টারে কুস্তি লড়ার চেয়ে বিশ-ত্রিশ পারসেন্ট চড়া দামের বাজারও ভাল। পিসির রাইটারও আমার এলাকার। নাম তোফা। সাত বছরের সাজা। মাসখানেক হলো জেলে এসেছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন বহুবার আমার হলে এসেছে, থেকেছে।

www.nagorikpathagar.org

হাইকোর্টে আপিল করে বেরিয়ে যাওয়ার শতভাগ বিশ্বাস নিয়ে আনন্দ স্ফূর্তিতেই আছে। যেমনি সাহসী তেমনি রসিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহবন্দী ছেলেরা ওকে ডাকে লক্ষ্মী ভাই বলে। বসতে বললেই বলত–"আমাগো পায়ে পায়ে লক্ষ্মী, যত হাঁটুম, তত খাওন, তত ট্যাকা"। এই সরল কৌতুকবোধের মধ্য দিয়ে ছেলেটি যে কি অকাট্য সত্য প্রকাশ করেছে তা হয়তো সে নিজেও জানে না।

কেইস টেবিল লেখা সাইনবোর্ডটির সামনেই রয়েছে একটি টেবিল ও চেয়ার। টেবিলের উপর খান কতক রেজিস্ট্রার খাতা। পিছনে বিচার বৈঠক সাইনবোর্ড আঁটা নির্যাতন কক্ষ। নির্যাতন কক্ষের দেয়ালে সারিবদ্ধভাবে পুঁতা পেরেকে ঝুলানো রয়েছে অত্যাচারের যতোসব আদিম–আধুনিক যন্ত্রপাতি। চেয়ারের পিছনের দিকটায় দাঁড়িয়ে থাকেন ডেপুটি জেলার ও সুবেদার। সামনে সারিবদ্ধভাবে আমরা ফাইলের পাবলিক। "বন্দীগণ সাবধান!" শব্দগুলো শোনার সাথে সাথেই আমরা যেন একযোগে দাঁড়িয়ে লম্বা একটি সালাম ঠুকি–বারকয়েক সেই তালিম দেওয়া হলো। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জেলার মহোদয় তশরিফ রাখলেন। আগে পিছে পাইক-পেয়াদা, ডাইনে-বাঁয়ে আরদালি- বরকন্দাজ। পিছনে দাঁড়িয়ে একজন চাপরাসি বিরামহীনভাবে বাদশাহী পাখার রশি টেনে টেনে বিলাতি সাম্রাজের শেষ আনুগত্য প্রদর্শন করে যাচ্ছে। শুরু হলো নতুন আসামীদের ওয়ার্ড পাস। সীট বন্টন ব্যবস্থায় আমার সিরিয়াল আসতেই কিছুটা ভরকে গিয়েছিলাম। তবে মুহূর্তেই নিজের পরিচয় দিতে ভুল করিনি। কাজও হলো। রাজনৈতিক বন্দীদের যথাযথ মূল্যায়ন করলেন। এখনও পুলিশী পোশাক ওনার ভদ্রতা জ্ঞানকে একেবারে কেড়ে নিতে পারেনি বলেই মনে হলো। এরপর মেডিকেল ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড পর্ব। ওজন ও উচ্চতা পরিমাপকে যদি মেডিকেল ধরা হয় তাহলে বলতে হবে আমার এই প্রিয় বাংলাদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের ভবিষ্যত এখনো তিমিরেই আছে। তবে জেলজীবনে এই কার্ডটির গুরুত্ব অনেক। একজন বন্দীর টাকা–পয়সা, মেডিকেল ডাইট, মামলার খতিয়ান, লাইব্রেরীর বই ইস্যু থেকে শুরু করে কয়েদিদের দণ্ড রেয়াতের হিসাবসহ সার্বিক পরিসংখ্যান এই কার্ডে থাকে। জেলে থাকার দুর্ভাগ্য হলে কার্ডটি যত্ন করে রাখতে ভুলবেন না। যাইহোক, আমার থাকার ব্যবস্থা হলো দশ নম্বর সেলে। বলা হয়, মানের বিবেচনায় ডিভিশনের পরই এর অবস্থান।

www.nagorikpathagar.org

জেলে পান থেকে চুন খসলেই কেইস টেবিলে putup। বিচারে শাস্তির ব্যবস্থাটা মধ্যযুগীয়। ছোটখাটো অপরাধে নগদে দৈহিক নির্যাতন, বড় অপরাধের শাস্তি–ডাণ্ডাবেড়ী, Punishment Cell–এ প্রেরণ অথবা মফস্বলের জেলে চালান। জজ কোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের মতো এখানেও অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে এজলাসের স্তরভেদ আছে। সুবেদার ফাইল, জেলার ফাইল, সুপার ফাইল ইত্যাদি। উপযুক্ত দক্ষিণার ব্যবস্থা করা গেলে অবশ্য কোন ঘটনাই putup পর্যন্ত গড়ায় না। জেল খেটেছে অথচ putup খায় নাই, এমন ঘটনা বিরল। এমন আক্কেল সেলামি আমাকেও দু'একবার দিতে হয়েছে। আমার এলাকায় বাড়ি নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত জেলসিপাই আউলাদ। নিজের নামে বরাদ্ধ দেখিয়ে প্রতিদিন আমাকে বাইরের হোটেল থেকে নাস্তা এনে খাওয়াতো। হঠাৎ একদিন জমাদারের হাতে ধরা পড়ে গেল। ওর চাকুরীর কথা বিবেচনা করে ২০০ টাকা ঘুষ দিয়ে আমাকে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হয়েছিল। putup খাওয়া নিয়ে জেলখানায় একটা মজার গল্প চালু আছে। মা এসেছে ছেলেকে দেখতে জেল গেইটে অনেক খাবার-দাবার নিয়ে। ছেলে মাকে বলছে, 'মা আমার দুইশ টাকার জরুরী দরকার, putup খাইছি।' মা-তো রেগে আগুন, 'এতো খাওন দেই, তারপরও putup কেন খাও বাবা।' অবশ্য অপরাধ অনুসারে প্রয়োজনীয় মাল ঢাললেই বেকসুর খালাস। নির্দ্বিধায় বলা যায়, কেস্টো ফাইল জেল কর্মকর্তাদের লাইফ স্টাইলে যথেষ্ট অবদান রাখছে। তাই নিয়মের বিধান রক্ষার এই টেবিলে মিয়াসাহেব থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কারও দায়িত্ব পালনে তৎপরতার অভাব লক্ষ্য করা যায় না।

আমদানি ও কেইস টেবিল পর্ব শেষ করে দশ নম্বর সেলের গেইটে এসেই অবাক বিস্ময়ে হতবাক হলাম। আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক সহকর্মী সোবাহান, ডগ শিশির, সুন্দর শিশির ও জাহিদ। ওদেরকে দেখে ক্ষণিকের জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেলাম। মনে হলো, পরবাসে আপন ঘরের ঠিকানা পেলাম।

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ

সেল জীবনের গোপন কথা

আমদানি হতে সুবেদার ও চীফ রাইটারের সাথে দশ নম্বর সেলে আসতে আশেপাশে মেন্টাল ও স্কুল ওয়ার্ডসমূহের করুণ চিত্র দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। দশ নম্বর সেলে পা রেখেই মনে হলো–ভালো মানুষ মনে না করে হোক, অন্ততঃ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কিছুটা হলেও ভাল জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একজন রাজনৈতিক কর্মীর কাছে এই স্বীকৃতিটুকু অনেক কিছু। কৌতূহলী পাঠকের মনে হাজারো প্রশ্ন থাকতেই পারে–জেলখানায় বন্দীরা কেমন করে সময় কাটায়! কেমন তাদের থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থা এবং চলার–বলার কতটুকু স্বাধীনতা তারা পান কিংবা কেমন দেখতে ফাঁসীর মঞ্চটি? এই তো গতকাল কবিতা এসেছিল, আমার সহধর্মিনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ওর অনেক কৌতূহল। জেলে আমাকে শিকল পরিয়ে রাখা হয় কিনা, নির্যাতন করা হয় কিনা? রেডিও এন্টিনার কাজে ব্যবহার করার জন্য পাঁচ গজ তার আনিয়েছিলাম। এতে ওর ধারণা হয়েছে এই তার দিয়ে হয়তো বিদ্যুতের শক্ দেয়া হয়। বুঝুন অবস্থা! এরপর গড়পড়তা মানুষের এই চার দেয়ালের অন্ধকার জগৎ সম্পর্কে কত ভাবনা, কত কৌতূহল ও কত বিচিত্র ধারণারই না জন্ম হতে পারে। ইতিমধ্যে আমদানি ও কেইস টেবিলের বর্ণনা দিয়েছি। ভাগ্য যদি স্মৃতির সাথে প্রতারণা না করে তাহলে এমনি করে আমি আমার প্রিয় পাঠকদের জেলখানার চারদেয়ালের ভেতরের প্রতি ইঞ্চি মাটি, প্রতিটি ঘটনা–দুর্ঘটনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রত্যাশা রাখি। কবির মুক্তি তত্ত্বের সাথে আমার জেলতত্ত্বের মিল না থাকলেও অচেনা জগতে বন্দী যখন হয়েছি তখন চিনে নিয়ে এবং চিনিয়ে নিয়েই খালাসের আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করব–

রে অচেনা, মোর মুষ্ঠি ছাড়াবি কি করে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে।

জেলখানায় একটি প্রবাদ চালু আছে, 'জেলের মজা সেল'। তবে সেলের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিস্তর প্রভেদ। আগেই বলেছি, আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে দশ নম্বর সেলে। দশ কক্ষ বিশিষ্ট একটি একতলা ভবন। লেখকের ভাষায়, "গরমের দিনে এর মধ্যে টেকা যায় না। এক মুঠো বাতাস প্রবেশ করার ব্যবস্থা নেই। ঘরের বাইরের চার-পাঁচ হাত জায়গা বাদে উঁচু দেয়াল। আলো বাতাস প্রাণপণে আটকিয়ে রাখবার জন্য এমন খাসা ব্যবস্থা আর হয় না। শীতকালে ঘর স্যাঁতস্যাতে থাকার কারণে শীত অত্যন্ত বেশী অনুভূত হয়। শীতের প্রচণ্ডতা, গ্রীষ্মের প্রখরতা আর আলো বাতাসের স্বল্পতাই দশ সেলের বৈশিষ্ট্য"। চারপার্শ্বে আটফুট উঁচু বহিঃ প্রাচীর। প্রতিটি ভবনকেই এই রকম

www.nagorikpathagar.org

আলাদা বাউণ্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘিরে রেখে আন্তঃভবন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে নিরাপত্তার কারণে। ভবনের সামনে মনোরম ফুলের বাগান। বাগানের চারদিকে হাঁটা-চলার বিস্তর জায়গা। পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে দশটি বাথরুম। প্রতিটি কক্ষে একটি করে বাথরুম থাকলেও দিনের বেলায় সাধারণতঃ বাইরের টয়লেট ব্যবহারের রেওয়াজ চালু আছে। গোসলের জন্য একটি পানির হাউজ। তবে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে জলসংকোচন নীতি বড়ই পীড়াদায়ক। সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা পানি সাপ্লাই। কিন্তু জলপতনের ধীরগতি অসম্ভব বিরক্তির উদ্রেক করে। বাউণ্ডারি ওয়াল ঘেঁষে সারি সারি নারিকেল গাছ। ফলে ফলে সুশোভিত। কিন্তু ডাব পাড়লেই putup, কেইস টেবিলে নালিশ এবং পানিশমেন্ট সেলে স্থানান্তর। হাউজের পাড়ে এক ধরনের কপি জাতীয় গাছের চাষ করা হয়েছে। শুনেছি, জেলার সাহেব বিদেশ থেকে চারা এনে চাষ করিয়েছেন। সরকারী জায়গা এবং বিনা পয়সায় কাজের লোক পাওয়া গেলে যা হয়, এখানে তাই হয়েছে। হাতের নাগালে অথচ ধরা-ছোঁয়ার কত বাইরে। তবে ফাঁক-ফোঁকরে যে দুইএকটি কপি একেবারেই বেহাত হয় না তা নয়। সেলগুলোর নামকরণ করা হয়েছে ভবনের সেল বা কক্ষের সংখ্যানুসারে। দশ নম্বর সেল মানেই হলো দশ কক্ষ বিশিষ্ট ভবন। নাইন্টি সেল মানে ভবনটিতে নব্বইটি কক্ষ আছে। তবে জেলখানার অধিকাংশ আসামী থাকে হলভবনগুলোতে। জেলের ভাষায় এগুলোকে বলা হয় 'খাতা'। সেলগুলোর প্রতিটি কক্ষে কতজন বন্দী রাখা হবে তার কোন বিধান নেই। সাধারণত কক্ষপ্রতি পাঁচ-ছয়জন হতে আরম্ভ করে বারো-তেরোজন পর্যন্ত বন্দী রাখা হয়। তবে কক্ষপ্রতি বন্দীসংখ্যা হতে হবে বেজোড় সংখ্যায়। কেন, তার কোন সদুত্তর খুঁজে পাইনি। হুবহু ইউনিভার্সিটির ফোরসীটেড রুমের প্রতি সীটে ডাব্‌লিং থাকার মতো। তফাৎ এই, হলে খাট, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি আছে। জেলখানায় শুতে হয় মেঝেতে। এর মধ্যে সান্ত্বনার কথা এই যে, কোন একদল লোক নয়, শ্রেণীবিভেদ নির্বিশেষে ফকির-বাদশাহ্ সকলের জন্যই ঢালাই বিছানা। তবে রাজনৈতিক গুরুত্ব ও নিরাপত্তাজনিত কারণে অনেককে একা এক কক্ষেও রাখার দৃষ্টান্ত আছে। জাগপা সভাপতি জনাব সফিউল আলম প্রধানকে একা এক কক্ষে থাকতে দেখেছি।

জেলখানার সেল এলাকায় দৈনিক কার্যপদ্ধতি মোটামুটি এইরকম ঃ সকাল ছয়টায় বিছানা ছেড়ে জেগে উঠা। তারপর বিশ-তিরিশ মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, স্নান, আটটায় প্রাতঃরাশ। এরপর ঘণ্টা দুই উদ্দেশ্যহীন হাঁটা-চলা। বিরামহীন তাসের আড্ডা। দুপুর বারোটায় আসে দৈনিক পত্রিকা। ইচ্ছা করলেই মনের মতো পত্রিকা পড়ার উপায় জেলখানায় নেই। জেল সুপারের অনুমতি সাপেক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত তালিকা থেকে পছন্দসই যে কোন একটি পত্রিকা আপনি বেছে নিতে পারেন। সোজা কথায় যাকে বলা হয় প্রো-গভর্নমেন্ট পত্রিকা। আওয়ামী সরকারের আমলে জেলখানায় অনুমোদিত খবরের কাগজের তালিকায় ছিল- ইত্তেফাক, সংবাদ, জনকণ্ঠ এবং

www.nagorikpathagar.org

অবজারভার। তবে পত্রিকা পড়ার খরচ বহন করতে হয় বন্দীদের পার্সোনাল একাউন্ট থেকে। দুপুর একটার সময় আহার ও কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম। আবার দিনের দ্বিতীয় দফা তাসের আসর। এরই ফাঁকে বই পড়া, লেখালেখি করা। চারটায় শুরু হয় বৈকালিক হাঁটা-চলা। সচল দেহ অলসতায় যাতে অচল না হয়ে পড়ে তার জন্য সকাল-সন্ধ্যা হাঁটা-চলার দাওয়াইটি সকলেই কমবেশি গ্রহণ করে নিয়েছে। বিকাল পাঁচটায় লকআপ। বারো ঘণ্টার জন্য তালা বন্ধ। সন্ধ্যায় আযানের সাথে সাথেই চুল্লী জ্বলে উঠে। শুরু হয় ইনস্ট্যান্ট নুডুল্‌স ও চায়ের আয়োজন। এরপর বিরতিহীন তাসের মেলা বসে রাত দশটা অবধি। তাস খেলাও যে জীবনের ধরাবাঁধা অংশ হয়ে উঠতে পারে, জেলখানায় না আসলে তা অনুমান করা যেত না। ফাঁকে স্বল্প বিরতিতে কান লাগাই বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা অনুষ্ঠানে। রাত দশটায় দ্বিতীয় দফা চুল্লী যজ্ঞ। এরপর তালাবদ্ধ ঘরে বসে রাত পোহাবার অপেক্ষায় থাকা।

জেলখানার রাত। এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। বিকেল পাঁচটায় লকআপ। খোলা হয় সকালের গুনতি মেলার পর। গুনতি না মিললে শুরু হয় অন্তহীন প্রতীক্ষার প্রহর। ভাবতেও অবাক লাগে, খোদার দেয়া চব্বিশ ঘন্টার এই দিনে বারো ঘন্টারও বেশি সময় ধরে তালাবন্দী জীবন কাটিয়েছি। রাতের সৌন্দর্য অবলোকনেরও যে খায়েশ জন্ম নিতে পারে, আকাশ দেখারও যে অহেতুক ইচ্ছার উদ্রেক হতে পারে জেলখানায় না আসলে বোধ হয় তা বোধগম্য হত না। সকালবেলা লকআপ খোলার সাথে সাথেই নীড় ছেড়ে যাওয়া ভোরের পাখিদের কলরবের মতো কিচিরমিচির আওয়াজ। কার আগে কে বের হবে। সন্ধ্যা লকআপের পর ঘন্টায় ঘন্টায় মিয়াসাহেবদের জিজ্ঞাসা-আপনারা কয়জন, অহেতুক বিরক্তির সৃষ্টি করে। সার্বিক দৃশ্যটি অনেকটা চিড়িয়াখানার খাঁচাবন্দী প্রাণীর মতো। বন্ধ ঘরের অন্ধকারে ঘুমিয়ে নেব, সে উপায় নেই। কারণ, বাতি জ্বলে সারা রাত ধরে। হাতের কাছে বিজলী বাতির সুইচ থাকলেও নেভানো যাবে না। জেলখানার এটাই নিয়ম। কি আর করা। তালাবদ্ধ আলোকিত ঘরে বসে লোহার গরাদ ধরে উদাস নয়নে সামনের বাগানের দিতে তাকিয়ে থাকা আর অন্তহীন ভাবনা-

"সময় তুমি বৃদ্ধ যাযাবর"

হাজারো বিধি-নিষেধের মধ্যে বন্দীদের রান্নার আসর অনেকটা রূপকথার মতো। পাঠক ভাববেন, কোথায় পাবে চুল্লী, কোথায় পাবে জ্বালানী, কোথা হতেই বা এলো হাঁড়ি-পাতিল। অথচ কি বিচিত্র এ আয়োজন। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই কষ্ট হতো। রান্নার এই আয়োজনকে জ্বালানী সভ্যতার আদিম স্তরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। দুটি ইট পাশাপাশি রেখে মাঝখানে একটি কন্‌ডেন্স মিল্ক-এর খালি কৌটা বসিয়ে দিলেই হয়ে গেল চুল্লী। ইট পাওয়া না গেলে অলিভ অয়েলের খালি কৌটা ইটের বিকল্প হিসাবে ভাল কাজ দেয়। জেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া অ্যালুমিনিয়ামের সান্‌কী

www.nagorikpathagar.org

সাইজের থালা ব্যবহৃত হয় হাঁড়ি-পাতিল হিসাবে। জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় মোমবাতি ও পুরানো কাপড়ের ন্যাকড়া। ইঞ্চি দুই পাশ ও একহাত লম্বা টুকরা কাপড়ের উপর মোমের গুঁড়া বিছিয়ে মুড়িয়ে গুল্‌টি বানালেই হলো। গুল্‌টির গায়ে সরিষার তেল মেখে কৌটায় ফেলে আগুন দিলেই চুল্লী জ্বলতে শুরু করে। মোমের উপর প্রশাসনের নজরদারী একটু বেশি। মোম না থাকলে বিকল্প জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল, পলিথিন ব্যাগ, শাম্পুর কৌটা, পুরানো টুথব্রাশ ইত্যাদি। সবচেয়ে ভাল জ্বলে প্লাস্টিকের বদনা ও কনটেইনার। যে কারণে সেল এলাকায় বদনা খুব যত্ন করে রাখতে হয়। না হলে লকআপ খুললেই গালাগালির শব্দ-"কোন শালায় আমার বদনা খাইলরে?" লকআপের আগে যদি কেউ বাইরে কাপড় ছেড়ে আসেন তবে সকাল হতেই ওটাও খাওয়া শেষ। কোন জ্বালানীই যখন না থাকে তখন শুরু হয় বাগানের ফুল গাছের বাঁশের কঞ্চির ঠেকনা খাওয়া। জ্বালানীর প্রধান সরবরাহকারী হলো জেলখানার সুইপাররা। দামও সস্তা, পাঁচ-দশ টাকার বেশি নয়।

জেলখানার সম্বল, থালা-বাটি-কম্বল। কথাটি হাড়ে হাড়ে সত্য। এর বেশি কোন একটি জিনিসও সরবরাহ করা হয় না। অথচ জীবনযাপনের জন্য কত জিনিসেরই না প্রয়োজন হয়। জেলে চাকু, ছুরি কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। তাই বলে কাটা ছেঁড়ার কাজ থেমে থাকে না। কয়েলের স্ট্যান্ডকে সিমেন্টে ঘষে ধারালো করে ছুরি হিসাবে পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। জেলের ভাষায় বলে কাট্‌নি। কোকের খালি ক্যান ব্যবহৃত হয় পানি খাওয়ার গ্লাস হিসাবে। জগের ঢাকনা ও ফ্লাস্কের মুখা ছিল আমাদের চায়ের কাপ। লেখালেখির কাগজের সংকট ভীষণ। সিগারেট ও মোমবাতির খালি প্যাকেট ব্যবহৃত হয় চিঠি লেখার প্যাড হিসাবে। লাইব্রেরীর বই পড়তে গিয়ে আরেকটি মজার বিষয় লক্ষ্য করলাম। প্রতিটি বইয়েরই বিভিন্ন অনুচ্ছেদের সামনে পিছনের খালি স্পেসে তাস খেলার স্কোর লেখা। জেলখানায় আরেকটি বিষয় বড়ই স্ববিরোধী মনে হলো। জেলে সিগারেট বৈধ কিন্তু দিয়াশলাই এবং ম্যাচ লাইটার অবৈধ। মশারি নিষিদ্ধ কিন্তু কয়েল জ্বলছে অহরহ। বৈদ্যুতিক পাখার সরবরাহ নেই অথচ হাত পাখার অনুমতি দিবে না। আজব সব কারবার।

দশ সেলে যাদের সাহচর্য আমার বন্দী জীবনকে নৈরাশ্য ও বেদনার দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে, তাদের কথা না বললে আমার অনেক ঋণ থেকে যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা সোবহান। হয়রানীমূলক অস্ত্র মামলায় ত্রিশ মাস থেকে জেলে আছে। সোবাহান না থাকলে আমার বন্দী জীবন অনেক বেশি দুর্বিসহ হয়ে উঠতে পারত। আমার এই লেখার উপাত্ত সংগ্রহ, উৎসাহ ও প্রেরণা অনেকাংশই ওর কাছ থেকেই পাওয়া। জেলের সবকিছুই ওর নখদর্পনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহবন্দীরা ওকে ডাকে সুমহান বলে। প্রতিশ্রুতিশীল এই তরুণের জেলজীবনের কবে ইতি ঘটবে জানি না। সকলের চেয়ে বয়সে

www.nagorikpathagar.org

ছোট, প্রথম বর্ষের ছাত্র জাহিদ। একবছর হলো জেলে আছে। চলনে-বলনে স্মার্ট ছেলেটির ভদ্রতা জ্ঞান আছে। বিশ্বাস করি, জীবনের কিছুটা সময় ওর হারিয়ে গেল বটে, বিনিময়ে যে বহুমুখী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, জীবন চলার পথে তার মূল্যও অনেক। ডগ শিশির বরিশালের ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকাকালীন কুকুর পালত বলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই নামের এই বিবর্তন ঘটেছে। মাঠকর্মী হিসাবে পরিচিতি আছে। ইউনিভার্সিটির আরেক ছাত্রনেতা সুন্দর শিশির। একরোখা স্বভাবের। তবে ওর সাহসিকতা প্রশংসার দাবি রাখে। ডানদিকের পার্শ্ববর্তী কক্ষে থাকে ধানমন্ডির যুবনেতা ওয়াহিদ ভাই। বিনা মামলায় জেল খাটছে। ওনার বিরোদ্ধে নির্বাচনকালীন সময়ে শেখ হাসিনাকে গুলি করার অভিযোগ আছে। মহামন্য আদালত তাকে এই দায়ভার থেকে খালাস দিলেও অহেতুক পুলিশি হয়রানির অবসান ঘটে নাই। বাঁ দিকের কক্ষে থাকতো নারায়ণগঞ্জের সাহসী তরুণ জাকির খান, জগন্নাথের খালেক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী মাজহারুল ইসলাম বাবু ও মোহাম্মদপুরের ইমন-মামুনের মামুন। সকলেই ভীষণভাবে কো-অপারেটিভ। সর্বোপরি শফিউল আলম প্রধানের কথা না বললে অনেক ছিুই না বলা থেকে যায়। অসম্ভব সম্মোহনী শক্তির অধিকারী। কেমন করে যে এসেই সকলের মন জয় করে নিল টেরই পেলাম না। ওনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও গভীরতা সম্পর্কে মন্তব্য করি-এমন জ্ঞানের পরিধি আমার নেই। আমার দ্বিতীয় কারাবাসের বেশীরভাগ সময় কেটেছে সোহেল ভাইয়ের সান্নিধ্যে। হাবীব-উন-নবী সোহেল, ভারি চমৎকার মানুষ। রাজনীতির অনাবশ্যক জটিলতা ওনার সাংস্কৃতিক মননশীলতাকে এখনো কেড়ে নিতে পারেনি। মাঝ রাতে লোহার গরাদ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে সোহেল ভাই যখন দরাজ গলায় আবৃত্তি শুরু করতো, তখন ক্ষণিকের জন্যে হলেও জেলখানার সমস্ত বেদনা ভুলে যাবার উপায় হতো। ডেল কার্ণেগীর মতে, কারো সমালোচনা না করে থাকতে পারাটাই যদি উত্তম মানুষের অন্যতম গুণ হয়ে থাকে, সেই অর্থে সোহেল ভাইকে নিখাদ ভালো মানুষ বলাটা অন্যায় হবে না। কালের আবর্তে যারা এই দশ সেলে থেকে গেছেন তাদের মধ্যে আছেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া থেকে শুরু করে হালের শেখ মুজিব হত্যা মামলা ও জেলহত্যা মামলার আসামীরা। শুনেছি, এই দশ সেলে একবার জুলফিকার আলী ভুট্টো এসেছিলেন তার এক পরিচিত জনের সাথে দেখা করতে। ষাটের দশকের শুরুতে মানিক মিয়া, খন্দকার মোশতাক, শাহ মোয়াজ্জেম, কে এম, ওবায়দুর রহমান, হাফেজ মুসাসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রায় উনিশজন নেতা একসাথে দশ সেলে ছিলেন। মোট কথা, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দশ নম্বর সেল এদেশের রাজনীতির ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, কালের নিরব স্বাক্ষী। সময়ের বিবর্তনে মান হরালেও পরিবর্তনের এই স্রোতধারায় দশ সেল কালে কালে অনেক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের বুকে ধারণের ইতিহাসকে পুঁজি করে এখনো মাথা উচুঁ করে দাড়িয়ে আছে।

www.nagorikpathagar.org

ছয়

খাতা ঃ বারোয়ারি মানুষের জঘন্য মিলনমেলা

পুরান ঢাকা না দেখলে যেমন ঢাকা দেখা হয় না, কোলকাতা না দেখলে যেমন ভারতবর্ষ দেখা হয় না, তেমনি খাতায় (খাদা) না থাকলে জেল খেটেছি বলা চলে না। বিস্ময়কর এ জগৎ ভাবনার অতীত। মূনুষ্যকুলের এহেন ভাবশক্তি নেই যে, মনে মনে খাতার একটি কল্পনাচিত্র তৈরী করে নিতে পারে। লম্বা হল ঘরের ন্যায় একাধিক ফ্লোরবিশিষ্ট ভবনগুলোকে বলে খাতা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে তৈরী খাতা ভবনগুলোর বড়ই করুণ হাল। পড়পড় অবস্থা। সিঁড়িতে হাঁটাচলা করলে পুরো ভবনই কেঁপে উঠে। ঢাকা কারাগারে খাতার সংখ্যা পাঁচটি। প্রত্যেকটিতে লোকসংখ্যা এক হাজারের উপর। সাধারণ গড়পড়তা বন্দীদের রাখা হয় খাতা এলাকায়। খাতা, বারোয়ারি মানুষের এক জঘন্য মিলনমেলা। সবকিছু এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, জীর্ণ, অপরিপক্ক, দুঃখ–দুদর্শা ও দুষ্কর্মে ভরা। সম্ভবপর সকল প্রকার বীভৎস উৎপাত এখানে আসন গেড়েছে। যাদের হাতে ধন আছে, তাদের ধনগরিমার ইতরতা এবং সেই ধনের পিছে রোগতপ্ত, অভুক্ত, হতভাগ্য নিরূপায় মানুষের ঢল বড়ই মর্মন্তুদ। সুইপারদের আশ্রয়স্থল ঘন্টিঘর এর কাছাকাছি একটি সুরঙ্গ পথের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বলা হয়, এই সুরঙ্গ পথের অপর প্রান্তে লালবাগ কেল্লা। সম্ভবত মোঘল সম্রাটরা এই খাতাগুলোকে গোপন গোলাবারুদের গুদাম কিংবা ঘোড়াশালা হিসাবে ব্যবহার করতো। শোনা যায়, ৯০-এর দশকের প্রথম দিকে এই সুরঙ্গ পথের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

খাতার প্রত্যেকটি ফ্লোরকে বলে একেকটি ওয়ার্ড। প্রতি ওয়ার্ডে লোকসংখ্যা দুশ থেকে তিনশ কিংবা তারও উপরে। মাঝখানে গোটা দুই ল্যাট্রিন। ল্যাট্রিনের দেয়াল বড় জোর দুই হাত উঁচু। দরজার বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে চটের ঢাকনা। পানি সাপ্লাই কোন কালে নিয়মিত ছিল না, আজও নেই এবং ভবিষ্যতেও যে থাকবেনা সেটা নিশ্চিত। অনবরত প্রশ্রাবের ছিটায় চটের ঢাকনার নিচের অংশ খসে পড়েছে। নিতান্ত জরুরী বলেই লজ্জা–শরমের মাথা খেয়ে বন্দীরা ওই পায়খানা ব্যবহার করছে এবং করতে হচ্ছে। তাছাড়া বহু কষ্টে যদিও বা বাথরুমের সিরিয়াল মিলে, একমিনিট যেতে না যেতেই চিৎকার "ভাই, বাইর হন, আর পারতাছি না।" গলা খ্যাঁকরানি অব্যাহত না রাখলে কখন যে, হ্যাঁচকা টানে ঢাকনা খুলে আরেকজন ঢুকে পড়বে টেরই পাবেন না। খাতায় গোসলের দৃশ্যটি বড়ই নির্মম। সকালবেলা তালা খুলতেই হাজার

www.nagorikpathagar.org

মানুষের হৈ চৈ শব্দ। কার আগে কে বের হবে। সকলেরই টারগেট হাউজ পাড়ে একটু জায়গা করে নেয়া। পানির জন্য ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি দেখে মনে হবে এ যেন নতুন কোন কারবালার প্রান্তর। লাঙ্গল বন্দের গঙ্গাস্নানের দৃশ্য যারা দেখেছেন কিংবা আমিন বাজার ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে কোরবানীর মৌসুমে গাবতলীর গরুর হাটের এক হাঁটু কাদায় মানুষ ও গরুর গাদাগাদি যারা লক্ষ্য করেছেন, তারা কিছুটা হলেও গোসলের এই বীভৎস রূপটি অনুমান করতে পারবেন। একজনের পানিতে দু'জনের গোসল হয়ে গেল। শারীরিকভাবে ক্ষীণ ও অর্থনৈতিকভাবে দীন যারা তারা অন্যের গোসলের সময় পায়ের কাছে বসে থাকে। অপরের গা গড়িয়ে পড়া জল দিয়ে ওদের গোসল সারতে হয়। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। অনেকে দিনের পর দিন গোসলের সুযোগ পায় না। কাপড় কাচবার সুযোগও সীমিত। দীর্ঘদিন ময়লা কাপড় পরে থাকতে হয় ওদের। অস্বাস্থ্যকর এই পরিবেশে রোগবালাই এসে বাসা বেঁধেছে। খোস-পাঁচড়াসহ নানান অসুখ–বিসুখের মহোৎসব চলছে যেন। খাতায় দর্শন দিয়েছেন অথচ চর্মরোগ হয়নি এমন ঘটনা বিরল। চিকিৎসার ব্যবস্থাও অপ্রতুল। সপ্তাহে একদিন কারা হাসাপাতালে যাবার সুযোগ হয়। ঘণ্টা দুই লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে গোটা দুই প্যারাসিটামল ও পরিচ্ছন্ন থাকার কড়া নছিহত নিয়েই ফেরত আসতে হয়।

ওয়ার্ডগুলোতে শোয়ার ব্যবস্থা তিন সারিতে। দুই পাশে দেয়াল ঘেঁষে আয়েশ করে যারা বিছানা পাতার সুযোগ পান তারা পুরান হাজতি। মাঝের সারিতে গাদাগাদি করে শোয়ানো হয় নতুনদের। জেলের ভাষায় বলে আমদানি ফাইল বা ইলিশ ফাইল। আমদানির বর্ণনায় ইলিশ ফাইলের কথা আগেও বলেছি। একজন করে ধরে এনে, একফুট জায়গায় কাত করে ফেলেই আগাম কঞ্চির বাড়ি। নির্যাতনের এই বর্বরতা জায়গা সংকটের কারণে নয়। ভাল থাকা খাওয়ার জন্য যাতে ম্যাট পাহারার কাছে লেনদেনের মক্কেলে পরিণত হয় সেই জন্য এই নির্যাতনী ব্যবস্থা। এই প্রক্রিয়ায় হাড়কিপ্টা লোকজনও অর্থের চেয়ে জীবনের মূল্য বেশি মনে করে দিলদরিয়া ভাবে টাকা ঢালতে শুরু করে। খাতায় যত টাকা, তত আদর, তত মজা। মক্কেলের খরচ সপ্তাহ প্রতি সাতশ' টাকা। জেলের ভাষায় এদেরকে বলে মুরগী। আপনি যদি মুরগী বনে যান তাহলে আপনার বিছানা হবে কোণার পরিচ্ছন্ন জায়গায়। গোসলের জন্য থাকবে আগাম জলের ব্যবস্থা। গা ঘষে দেয়ার জন্য থাকবে দুইজন ফালতু। শরীর টিপে দেয়ার জন্য থাকবে একজন। স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থায় থাকবে ভাজি, ভর্তা ও সালাদ। গরমের দিনে সাধারণ পাখার বাতাসের জন্য লোক রেডি

www.nagorikpathagar.org

থাকবে। পায়খানায় যাবেন, আগে থেকে বদনা হাতে ফালতু হুজুরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। যত্ন-আত্তির সেকি আয়োজন। নরকে স্বর্গবাস। বাড়তি আয়োজন হিসাবে পকেটে বিড়ির প্যাকেট নিয়ে বিলি করতে থাকলে অনায়াসে হ্যামিলনের বংশীবাদক বনে যেতে পারেন। সার্বিক চিত্রটি আদিকালের দাস প্রথাকেও হার মানায়। খাতার সবচেয়ে বিরক্তিকর বিষয় গুনতি। ফজরের আযানের সাথে সাথেই চিৎকার "ফাইল–ফাইল"। মুহূর্তের মধ্যে চার কলামে সারিবদ্ধভাবে বসে যেতে হবে। অন্যথায় খামাখা মাইর–গুঁতা। গুনতি মিললে ঘন্টা খানেকের জন্য লকআপ খুলে দেয়া হবে। শুরু হলো গোসলের মরণযুদ্ধ। বারোটা বাজতেই বারো গুনতির ফাইল। আবার এক ঘন্টার মুক্তি। বিকেল পাঁচটায় লকআপ গুনতি। যদি ভুল করে কেউ গুনতির ফাইলে না বসেন, তাহলে যে বিচিত্র ভঙ্গির মাইর-গুঁতা তাতে জীবনে এমন ভুল দ্বিতীয়বার হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না নিশ্চিত।

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। খাতা এলাকায় এই রকম কিছু শয়তান বসবাস করে। বিনা কারণে মারামারি ও কাটাকাটি ওদের নিত্যদিনের অভ্যাস। বিদ্যুৎ চলে গেলে হঠাৎ কারো শরীরে ব্লেডের লম্বা এক ফাঁড় বসিয়ে দিবে। কোন কিছু করার না থাকলে ব্লেড দিয়ে নিজের শরীর জখম করতে শুরু করবে। শাস্তিও হয় অমানুষিক। তাতে ওদের কোন শোক আপসোস নেই। নিউ জেল গেইটে কুদ্দুস নামে এক বন্দীকে দেখলাম সারা শরীরে জালের মতো কাটাছেঁড়ার দাগ। জিজ্ঞেস করেছিলাম কেমন করে এমন হলো। একগাল হেসে জবাব দিল, সুন্দরবনের বাঘের সাথে যুদ্ধ করেছিলাম। মানসিক বৈকল্য ছাড়া আর কোন কারণ থাকতে পারে বলে মনে হলো না। ভাবি, বিধাতা এই দুনিয়ায় কত বিচিত্র মন ও মানুষেরই না জন্ম দিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষের অত্যাচার নির্যাতনের আদিম ও আধুনিক সকল কায়দা-কানুনকে জয় করে নিজের উচ্ছৃংখলতাকে বজায় রাখতে পেরেছে এমন একজন কয়েদির নাম জজমিয়া। একুশ বছরের যুবক হিরোইন আসক্ত জজমিয়া থাকে চৌদ্দ সেলে। কুখ্যাতিতে নম্বর ওয়ান জজমিয়াকে জেলখানায় সকলেই একনামে চিনে। চুরি ও মাইর এই দুটি বিদ্যাকে আত্মস্থ করে ক'দিনেই পাক্কা জেলবাজে পরিণত হয়েছে। দেখলেই মনে হয় আস্ত একটা মিচকে শয়তান। জেলাখানায় এ ধারকা মাল ওধার করাতে জজমিয়ার জুড়ি নেই। জজমিয়া কোন এলাকায় হাঁটাচলা করছে অথচ ওই এলাকার দু'চারটি জিনিসপত্র খোয়া যায়নি এমন ঘটনা বিরল। বড় নেতাদের রুমের সামনে চলায়-বলায় হাজতি কয়েদিরা আদব-কায়দা, তমিজ বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

www.nagorikpathagar.org

দশ সেলে জজমিয়ার ফালতু'র কাজের প্রথম দিন অতিবাহিত না হতেই সোহেল ভাইয়ের পাঁচশ টাকা ও পিন্টু ভাইয়ের আংটি খোয়া গেল। আংটিটি জজমিয়ার কাছ থেকে উদ্ধার হলেও টাকা পাঁচশর আর সন্ধান মিলেনি। নতুন জামাকাপড়, পাঞ্জাবী, লুঙ্গী, জুতা স্যান্ডেল ও বাড়তি কম্বলের প্রয়োজন হলে জজমিয়াকে আগাম অর্ডার দিয়ে রাখলেই হলো–পরদিন মালামাল সহ জজমিয়া হাজির। একদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি জজ লকআপের সামনে দাঁড়িয়ে। স্যার, কাইর‍্যা (বালতি) কিনবেন? অবাক কাণ্ড! ম্যাট পাহারাদের নানা কাজে ব্যবহৃত এই কাইর‍্যা জেলখানায় বড়ই প্রয়োজনীয় জিনিস। পঞ্চাশ টাকায় কাইর‍্যা বিক্রির পর দু'চার দিন জজ মিয়াকে আর দেখা যায়নি। মোটকথা, পর্যাপ্ত নেশার উপযুক্ত টাকা যতক্ষণ ওর হাতে আছে ততক্ষণ জজমিয়া শতভাগ খাঁটি মানুষ। জজমিয়াকে নিয়ে কারা প্রশাসনও বড় দুর্বিপাকে থাকে। এমন সব অদ্ভুত কর্মকাণ্ড করে বসে যে, শেষে জেলবাবুদের চাকুরী নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। জেলের ভাষায়, অকারণে ক্যারাব্যারা লাগানোই ওর খেয়াল। ওর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে গেলে হুদাহুদি আরেকটা ফ্যাসাদ লাগিয়ে দিবে। সেদিন ছিল ডি,আই,জি, ফাইল। ডি,আই,জি সাহেব জেল পরিদর্শন আসবেন। জজমিয়ার যতোসব কুটবুদ্ধি। ডি,আই,জি মহোদয় এসে দাঁড়িয়েছেন চৌদ্দ সেলে জজমিয়ার কক্ষের সামনে। হঠাৎ জজমিয়ার চিৎকার "স্যার, আমাকে একটা ব্লেড দেন।" চারিদিকে পিনপতন নীরবতা, কর্মকর্তারা সকলেই হতভম্ব হয়ে ভয়ে জড়োসড়। সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, এই ছেলে ব্লেড দিয়ে কি করবে? এমন একটা মুহূর্তের জন্যই যেন জজমিয়া অপেক্ষা করছিল। "কি করুম, দেখবি।" কথাটি বলেই লুঙ্গীর কোঁচড় থেকে একটা ঝকঝকে ব্লেড বের করে নিজের পেটের উপর আড়াআড়ি ফাঁড় দিতে শুরু করলো। প্রহরীদের হস্তক্ষেপের আগেই সারা পেট কেটেকুটে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। রক্তে ভেসে গেল পুরো কক্ষ, জজমিয়ার মুখে কিন্তু কোন কষ্টের ছাপ নেই। উপরন্তু কর্মকর্তা, তটস্থ কর্মচারীদের, ব্যতিব্যস্ততা দেখে জজমিয়ার সেকি বিদ্রূপের হাসি! তৎক্ষণাৎ জজমিয়াকে নিয়ে যাওয়া হলো কারা হাসপাতালে।

আমার দশ সেলের রুমমেট সহবন্দী কমিশনার চৌধুরী আলম তখন উপযুক্ত মাসোহারার বিনিময়ে সুস্থ শরীরে কারা হাসপাতালে রোগীর বিছানায় শুয়ে বন্দী জীবন কাটাচ্ছে। ভারি মজার লোক। সেই যে '৭১-এর রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সেই থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় আছে। যাকে বলে মাঠের মানুষ। তবে, রাজনীতির মাঠে লোকটির কর্মের তুলনায় প্রাপ্তি

www.nagorikpathagar.org

ঘটেছে নিতান্তই কম। অর্ধশত বছরের বয়সের সীমানা ছাপিয়ে কখন যে আমাদের তারুণ্যের বন্ধু হয়ে উঠেছিল টেরই পায়নি। যখন চেতনা হলো, তখন চৌধুরী ভাই মধ্যাহ্নের ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে মুক্তির সনদ নিয়ে মেইন গেইটের দিকে ছুটছে। আমরা পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখের কোণে একফোঁটা আনন্দাশ্রু এসে লুকোচুরি খেলে গেল। সেই সাথে একটা অসম্ভব বিষণ্নতা এসে গ্রাস করে নিল সকলকে।

মনে মনে অনুরণিত হলো, গুডবাই, চৌধুরী আলম, গুডবাই। যে কথা বলেছিলাম, চৌধুরী ভাইয়ের বিছানার পার্শ্বে মেঝেতে ফেলে তিন ঘণ্টা ধরে জজমিয়ার পেটের সেলাই কর্ম চললো। সেলাই পড়েছে ২০৩টি। চৌধুরী আলমের মুখে শুনেছি, তিনঘণ্টার সেই দুঃসহ সেলাই যন্ত্রণায় জজমিয়া একটু টুঁ-শব্দ পর্যন্ত করেনি। উপরন্তু আধ-ঘন্টা পর হঠাৎ হা হা করে অট্টহাসির শব্দ। রীতিমতো বিস্ময়কর। ওয়ার্ডের সকলেই ঔৎসুক্য নয়নে তাকিয়ে রইলো, কি হয়, কি হয়! চৌধুরী ভাই বললো, সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গতেই ছেলেটির কি অবস্থা হয় দেখার জন্য চোখ মেলেছি। জজমিয়া নেই। দেখি, বারান্দায়, এপাশ ওপাশ হাঁটাহাঁটি করছে। দেখে কে বলবে, কাল ছেলেটির শরীরে দুইশতাধিক সেলাই পড়েছে।

খাতা এলাকার ওয়ার্ড পাসের বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। কেইস টেবিলে সকালবেলা ফাইল কাটার সময় ওয়ার্ডের জন্য আসামী কেনাবেচার হাট বসে। বেচাকেনার ওই হাটের খদ্দের হলো প্রতিটি ওয়ার্ডের ইনচার্জ পাহারা। পাইকাররা নতুন আসামীদের চেহারা সুরৎ ও কাপড়চোপড় দেখে আন্দাজের উপর দাম হাঁকে। সাধারণ, অস্ত্র মামলা, খুনের মামলা ও নারী নির্যাতনের মামলার আসামীদের বাজারদর বেশি। কারণ, এদের দু'চার দিনে জামিন হওয়ার সম্ভাবনা কম। জেলের ভাষায়, নিজের অজান্তেই বিক্রি হয়ে যাওয়া এইসব বন্দীদের বলে মুরগী। মুরগীর হাটে রাজনৈতিক কর্মীদের কদর কম। ইনচার্জ পাহারা তার পছন্দসই মুরগীর নাম-ধাম লিখে একটি স্লিপ আমদানির ম্যাট পাহারার মাধ্যমে সুবেদারের কাছে পৌছে দিবে। সময়মতো ঠিকই কাজ হয়ে যাবে। তিন নম্বর খাতায় পরিবেশ একটু ভাল বলে তিন খাতার মুরগীর দাম মাথাপ্রতি তিনশ টাকা। অন্যান্য খাতার গড় মূল্য দুইশ টাকা। সুবেদারের ভাগে দু'শ টাকা, আমদানির ম্যাট পাহারার ভাগে পরে একশ টাকা। আপনি যদি ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে মুরগী বনে গিয়ে থাকেন তাহলে ওয়ার্ডে ঢুকতেই দেখবেন -চারদিকে বাঁকা চোখের চাহনি, আড়চোখের জিজ্ঞাসা-'মুরগী কতো হইল?' আসামীর সাথে কথা না বলে, নগদ পয়সায় অগ্রিম বিকিকিনির এই

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতিটি রিস্কি নয় এই জন্য যে, টাকা আদায়ের সকল ব্যবস্থাই ওদের জানা আছে। সুবেদার সাহেবের বাড়তি রুটিন ইনকামের জন্য রাখা হয়েছে পনের দিন অন্তর ওয়ার্ড বাছাই। ওয়ার্ড পরিবর্তন ঠেকাতে হলে কিংবা পছন্দসই ওয়ার্ডে যেতে হলে পারহেড চার্জ ১০০ টাকা। ৮০০০ বন্দীর মধ্যে কমসেকম ৪০০০ জন এই ১০০ টাকার ধকলে পড়বেই। অর্থাৎ, পাক্ষিক রোজগার দাঁড়ালো ৪ লক্ষ টাকা।

গেল বছর একসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিয়াত্তর জন ছাত্র গ্রেফতার হয়েছিল। ওদের ওয়ার্ড পাস ছিল নিউ জেলে। গোটা জেলখানার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় বহিঃ প্রাচীর ঘেঁষে নিউ জেলের অবস্থান। দেয়ালের ওপারে সরু রাস্তার পার্শ্বে উর্দু রোডের বহুতল বাড়িঘর। ছাদে ক'জন বালক ক্রিকেট খেলছিল। হঠাৎ ক্রিকেটের বল এসে পড়ল জেল চত্বরে। ছেলেগুলো চিৎকার করে বলতে শুরু করল-"চোর আঙ্কেল, চোর আঙ্কেল-বলটা দেন তো।" কথাগুলো শুনতে অপমানজনক হলেও বালকের ওই উক্তিটির ভিতর দিয়ে জেলখানা সম্পর্কে সমাজের যে নষ্ট ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তা আমার কাছে গুরুত্ব না থাকলেও সমাজতত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয় হতে পারে। এই নিউ জেলের এক নম্বর কক্ষে হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামানকে। সেলের মোটা মোটা লোহার রডে এখনও বুলেটের চিহ্ন স্পষ্ট। হাসিনা সরকারের আমলে কক্ষটিকে সংরক্ষণ করে নাম দেয়া হয়েছে 'মৃত্যুঞ্জয়ী'।

পাঁচ নম্বর খাতার পার্শ্বে নাজিমুদ্দিন রোডের দেয়াল ঘেঁষে মাক্কু শাহ্র মাজার। এই দরবেশকে নিয়ে জেলখানায় অনেক অলৌকিক কাহিনী চালু আছে। মাজারের অর্ধেকটা বাউণ্ডারি ওয়ালের ভিতরে। বাকি অর্ধেকটা ওয়ালের বাইরে। মৃত্যুর পূর্বে নাকি বলে গিয়েছিলেন, ওনাকে যেন জেলের ভিতরে কবর দেয়া হয় এবং ওনার সাজার মেয়াদ শেষ হলে যেন কবরটিকে জেলের বাইরে স্থানান্তরিত করা হয়। দরবেশের ইচ্ছানুযায়ী শাস্তির মেয়াদ শেষে বাউণ্ডারি ওয়াল ভেঙ্গে ভিতরের দিকে সরিয়ে এনে কবরটিকে বাইরে রাখা হয়েছে। পুরান ঢাকার লোকজন মাক্কু শাহ্র ভীষণ ভক্ত। কথিত আছে, প্রতিদিন মাক্কু শাহ্র মাজারে ফুল না দিলে জেলের গুনতি মিলে না।

www.nagorikpathagar.org

সাত
কারাগারের দেখার গেইট

কোন পক্ষ–বিপক্ষ বিশ্লেষণের রাজনৈতিক তত্ত্ব কথা নয়, এ লেখা একজন রাজনৈতিক কর্মীর বন্দী জীবনের কিছু সত্য কথা মাত্র। চলুন দৃষ্টি দেই, শিরোনাম শীর্ষক বিষয়বস্তু বাংলাদেশের একমাত্র কেন্দ্রীয় কারাগারের সাক্ষাৎকার কক্ষের দিকে। জেলের ভাষায় যাকে বলে দেখার গেইট।

মাঝামাঝি ঘন বুননের লোহার গ্রীল দেয়া দশ বর্গফুটের আটটি কক্ষ। সাড়ে সাত হাজার বন্দীর জন্য দেখাদেখির এই টুকুই ব্যবস্থা। দূর থেকে আবছা আলো–আঁধারির এই কক্ষগুলোকে মনে হবে, বক্সঅফিস হিট করা সিনেমার চলতি টিকেট কাউন্টার। দীর্ঘদেহী ও মজবুত শারীরিক গঠন না হলে, আমার মতো খাটো মানুষের ওই যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়াই ভাল। খাতা-কলমে নিয়ম আছে, জেলবন্দীদের সাক্ষাৎ–প্রার্থী দুই টাকা দিয়ে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করবে। টাকা দু'টি জমা হবে জেলের মসজিদ কল্যাণ ফান্ডে। আমার বন্দী জীবনে অবশ্য আমি দুই টাকায় সাক্ষাতের এই পদ্ধতিটির অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি।

দেখার গেইটের বাইরের প্রান্তে দালাল আছে। পঞ্চাশ টাকা অগ্রিমসহ সাক্ষাৎ প্রার্থীর নাম ধাম লিখে দিবেন। ভিতরের প্রান্তে থাকে কলিং রাইটার। জেলের অভ্যন্তরে কাউন্টার এর মূল দরজার পার্শ্বেই দেয়াল ঘেঁষে চেয়ার টেবিল নিয়ে বসেন একজন ডেপুটি জেলার। টেবিলের উপর থাকে টাকা সংগ্রহের ক্যাশবাক্স। জেলখানায় টাকা অবৈধ। কিন্তু ডেপুটি জেলাররা নিজেরাই যেভাবে আড়তদারদের মতো ক্যাশবাক্স নিয়ে উন্মুক্তভাবে ঘুষ গ্রহণের এই কর্মটি নিয়মিত করে যাচ্ছেন এতে করে জেলখানায় তো নিয়মনীতি বহাল থাকবার কথা নয়। যাই হোক, কলিং রাইটার টোল আদায়ের টেবিলে ডেপুটি মহাশয়কে পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে দুই টাকার একটি অনুমতিপত্র ক্রয় করবে। ভাগাভাগি হলো এই রকম–৩৩ টাকা ডেপুটির, ১৫ টাকা কলিংম্যান ও বাকি ২ টাকা পাবে কল্যাণ–ফান্ড। গড়ে প্রতিদিন সাড়ে তিনশ বন্দীর দেখা আসে। দুই টাকা হারে কল্যাণ ফান্ডে জমা দেয়ার পরও দিনপ্রতি কমপক্ষে হাজার দশেক টাকার ব্যবসা থাকে। আন্তঃবিভাগীয় ভাগাভাগির ব্যবস্থা নেই। যেদিন যার ডিউটি সেদিনের অর্থপ্রাপ্তিতে তাঁর এখতিয়ার শতভাগ। অতএব এর পুরোটাই পকেটস্থ হবে দায়িত্বে থাকা ডেপুটি সাহেবের। সাপ্তাহিক ছুটির দিন, ঈদ–উৎসব ও পূজাপার্বণে দেখার মক্কেলের ভিড় বেশি থাকে বলে অর্থের যোগানও থাকে বেশি। ফলে এই রকম বিশেষ দিনে টোল আদায়ের ডিউটির জন্য ডেপুটিদের মধ্যে তদ্বিরী প্রতিদ্বন্দিতা চলে অহরহ। কলিং রাইটদেরও দিনে রোজগার প্রায় তিনশ টাকা। ফলে কয়েদিদের মধ্যেও ঐ জায়গায় কাম পাসের জন্য ব্যাপক চাহিদা। শুনেছি, কলিং রাইটার

www.nagorikpathagar.org

হতে হলে জেলার মহোদয়কে সম্মানী প্রদান করতে হয় এককালীন আট হাজার টাকা।

অফিস কল ও ডিটেনশনের আসামীদের অনুমতির দেখার বিষয়টিও ভেজালে ভরা। আয়েশ করে অফিসে বসে দেখাদেখির দর বারোশ' টাকা। যার ভাগাভাগি এই রকম–ডেপুটি পাবেন পাঁচশ, গেইট সার্জেন তিনশ, গেইট অর্ডার তিনশ এবং চাবিওয়ালা পাবেন একশ টাকা। ডিটেনশনের অনুমতির দেখার জন্য গেইটে একটি আলাদা কাউন্টার আছে। তবে কথা বলতে গেলে এস,বি-র কর্মকর্তার দাঁড়িয়ে থাকাটা বিরক্তিকর ঠেকে। দুইশ টাকা ধরিয়ে না দিলে নির্ধারিত সময় শেষ না হতেই খামাখা বিরক্ত করা শুরু করবে। আবার ডিটেনশনের আসামী না হয়েও এস.বি ইন্সপেকটরকে একশ টাকা ঘুষ না দিলে ডিটেন্যূ কাউন্টারে নিরিবিলি কথা বলার ব্যবস্থা আছে। শুনেছি, এস, বি-ওয়ালাদেরও নাকি জেলখানায় পোষ্টিং-এর জন্য বড় অংকের মাল ঢালতে হয় উপরওয়ালাদের দরবারে।

দ্বিতীয় পর্ব মালামাল পরিবহন। দেখার গেইটে মাল হাতে নিয়েছেন তো মরেছেন। অনায়াসেই উঠে পড়লেন দুর্নীতির আজব পরিবহনে। যার জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় আস্ত দশ টাকার নোট। মালামাল হাতে সামনে চলছে রাইটার নামের মাল গাড়ি। ডাইনে বায়ে অনবরত নির্গত হতে হবে নগদ নোট। নোট দিবেন না তো মালও চলবে না। জেল কোডের নিয়ম অনুযায়ী বন্দীরা শুধুমাত্র হালকা খাবার জেলের ভিতরে নিয়ে যেত পারেন। চিড়া, মুড়ি, বিস্কুট–চানাচুর, বিড়ি–সিগারেট প্রভৃতি। মাল ঢাললে জেলকোডের বালাই নেই। এখানে টাকা হলে বাঘের চোখ না মিললেও মিয়াসাহেবদের চোখকে অন্ধ করে দিতে পারেন অনায়াসে। দেখার গেইটের একেবারে দুই প্রান্তে মালামাল গ্রহণের দুইটি খুপরি। খুপরিতে বসা মিয়াসাহেবকে পঞ্চাশ টাকা ধরিয়ে দিলে আগ্নেয়াস্ত্র ও লোহা কাটার হ্যাকসো ব্লেড ছাড়া বাকি সব মালই এপারে পৌঁছে যাবে। ডেপুটি যেখানে বসে, তার সামনেই কাঠের গেইট। কাঠের গেইটের চারজন মিয়াসাহেবকে দিবেন চল্লিশ টাকা। সিপাইদের ইনচার্জ সি,আই,ডি মিয়াসাহেবকে বিশ টাকা। একটু আগ বাড়িয়ে ঝর্ণার গেইটের মিয়াসাহেবকে দশ টাকা। ঝর্ণা গেইটের সামনে আমতলায় থাকে দশ-বারোজন লাঠি বাহিনী। তল্লাশীর এখতিয়ার নেই বলে ওদের জন্য বরাদ্দ একমুঠে বিশ টাকা। এইবার চলাচলের রাস্তা ক্লিন। যে এলাকায় থাকেন সেই এলাকার গেইটম্যানকে দশ টাকা এবং আপনার ভবনের দায়িত্বে থাকা মিয়াসাহেবকে দশ টাকা দিলেই প্রথম পর্ব শেষ। এরপর এলাকার সি,আই,ডি মিয়াসাহেব ও জমাদারকে যদি স্বেচ্ছায় গোটা বিশেক টাকা ধরিয়ে দেন তো সন্ধ্যা লকআপের সময় বাড়তি দু'টি লম্বা সালাম পেতে পারেন। টোল প্রদানের এই পরিবহন ব্যবস্থায় রান্না করা খাবার-দাবারসহ পলিথিনে মুড়ায়ে জবাই করা একটি আস্ত খাসি পর্যন্ত অনায়াসে ভিতরে নিয়ে আসতে পারেন। যদি কোন মাল না আনেন, তাহলেও মিয়াসাহেবদের অন্তর্বাস হাতানোর নোংরা পর্বটি পরিহার করার জন্য মহাশয়দের প্রতিজনের হাতে বিনয়ের সাথে একশলা করে

www.nagorikpathagar.org

সিগারেট ধরিয়ে দিতে হবে। তবে সমস্যা হয়েছিল সেদিন, টাক মাথা ওয়ালা মিয়াসাহেবকে গোল্ডলীফ সিগারেট হাতে দিতেই ভীষণ মাইণ্ড করে ফেললেন। আমি অধম কিছুতেই বুঝতে পারি নাই যে মিয়াসাহেব বাহাদুর বেনসন ছাড়া সিগারেট খান না। টাকা না দিলে জেলকোর্ড বহির্ভূত যে কোন জিনিসের জন্যই আপনাকে কেইস টেবিলে putup করা হবে। রায় হবে দন্ডি অথবা সেল ট্রান্সফার। দশ টাকার রেজরের জন্য সেল ট্রান্সফার ঠেকাতে এক হাজার টাকা ঘুষ দেয়া-নেয়ারও রেকর্ড আছে। প্রশাসনের স্বচ্ছতা প্রমাণের তাগিদে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যা putup দেখানোর খড়্গ চলে গরীব হাজতিদের উপর। মরার উপর খাঁড়ার ঘা। নগদ টাকা পরিবহনের নিয়মটি ভিন্নতর। গ্রীলের ফাঁক দিয়ে টাকা গ্রহণ করেই রাইটারের হাতে দিয়ে যাবেন। সময় মতো আপনার কক্ষে পৌঁছে যাবে। ক্যারিং চার্জ শতকরা দশ টাকা। তল্লাশী করে বাড়তি নগদ টাকা পাওয়া গেলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। বাজেয়াপ্ত টাকার এক-তৃতীয়াংশ পাবে উদ্ধারকারী এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ জমা হবে জেল কোষাগারে। এটাই নিয়ম। টাকার পরিমাণ কম হলে হয়তো মিয়াসাহেবরা চেনামুখ দেখে ছেড়ে দেন কিন্তু মোটা অংকের টাকা হলে এক -তৃতীয়াংশের লোভ সংবরণ করতে পারার কথা নয়।

দেখার গেইটের বাড়তি ঝামেলা পুরান ঢাকার কিছু আনকালচারড গুণ্ডা মাস্তান। দিনভর অকারণে গেটে বসে আড্ডা দেয়াই ওই তস্করদের কাজ। ওদের জন্য বন্দীদের স্বাচ্ছন্দে দেখা সাক্ষাতের কোন উপায় নেই। অবশ্য এক প্যাকেট সিগারেট দিলে আপনি আরাম করে কথা বলার সুযোগ পাবেন। অন্যথায় ফালতু অজুহাত দেখিয়ে মারপিট শুরু করে দিবে। এদের পল্লায় পড়লে অপমানের সীমা থাকে না। কর্তৃপক্ষকে মনে হলো এদের কাছে অনেকটা অসহায়। এদের জ্বালায় নবাগত বন্দীদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। নগদ টাকা কক্ষে পৌঁছে দেয়ার নাম করে এরা হরহামেশাই নিরীহ বন্দীদের সাথে প্রতারণা করছে। কারো বাড়ী থেকে ভাল খাবার-দাবার এলে জোর জবরদস্তি করে গেইটে বসেই খেয়ে নিবে। নেশাখোর বন্দীদের গেইটে বসে নির্বিঘ্নে নেশার সুযোগ করে দেয়ার নাম করে বখরা আদায় করে নেয়। মালামার বহনে অনভ্যস্ত বন্দীরা টাকার বিনিময়ে এদের সাহায্য নেন। এদের মধ্যে অনেকেই জেলখানাটাকে কর্মস্থল করে নিয়েছে। শুনেছি, এরা প্রয়োজন অনুযায়ী জেলে ঢুকে, সময় হলে জামিন করিয়ে নেয়। কেউ কেউ আছে, ভাড়ায় অন্যের কয়েদ খাটছে। গেইটে আসতে বাহির থেকে এদের কল স্লিপের প্রয়োজন হয় না। ভিতরেই এন্তেজাম করা আছে। বাহিরেও টাইম মতো লোকজন হাজির থাকে। ঢাকা শহরের অনেক গডফাদার ও শিল্পপতি আছে জেলখানায় যাদের সাতখুন মাফ। এমনও অনেক আছেন, যাদের একদিনও জেলের খানা খেতে হয় না। একেবারে খানদানি ব্যবস্থা। শুনেছি, বাড়তি মালের জোরে মদ্যপদের আস্ত মদের বোতল পর্যন্ত ভেতরে চলে আসতে পারে। মিয়াসাহেব থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনেকেই এদের সেবা-যত্নের জন্য প্রাণাতিপাত করতে প্রস্তুত থাকে।

www.nagorikpathagar.org

আট
জেল জগতের খানাপিনা

না খেয়ে মানুষ মরে না–প্রবাদ আছে। কথাটি সত্যি না হলে জেলের খাবার খেয়ে বন্দীদের বছরাধিককাল বেঁচে থাকবার কথা নয়। অবশ্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটকে টানানো বন্দীদের দৈনন্দিন খাবার মেন্যু দেখলে যে কোন ভোজনবিলাসী লোকের খাওয়া–দাওয়ার ব্যাপারে টেনশনমুক্ত থাকার কথা। দুর্ভাগ্য, সরবরাহকৃত খাবারের সাথে ঐ মেন্যুর আদৌ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বেমিলের এই অংকটা জেল কর্তৃপক্ষ ও খাবার সরবরাহকারী ঠিকাদারের মধ্যে আপোষে বন্টন রফা হয় কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। মেইন গেইটে টানানো খাবার তালিকার বর্ণনা অনাবশ্যক। আপাতত কি খেয়ে জেলে বন্দীদের দিনকাল কাটে তার একটা বর্ণনা দেয়া যাক।

সকালের নাস্তা ঃ আধাপোড়া, আধাকাঁচা, ন্যূনতম গোটাচারেক ছিদ্রযুক্ত অসম আকৃতির একটি আটার রুটি ও এক চিম্‌টি আখের গুড়। জেলের ভাষায় এই রুটিকে বলে ফাইলের নাস্তা বা ফাইলের রুটি। গুড়কে গুড় না বলে ঝোলা গুড়ের কালো 'গাদ' বলা সমীচীন হবে। রাত দশটা থেকে বড় চৌকায় এই রুটি বানানোর কার্যক্রম শুরু হয়ে চলে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। কাজেই পয়লা রাতে ভাজা রুটি যদি ভাগে পড়ে, তাহলে সেরেছে। গণ্ডারের চামড়ার মতো ঐ রুটি এমনই শক্ত যে, মিনিট কতক পানিতে ভিজিয়ে রাখা ছাড়া দাঁতে কাটা আদৌ সম্ভব নয়। রুটি বানানোর ডিউটি শেষে নাইট চৌকার লোকজন যখন ফিরে আসে তখন ওদের হাঁটু পর্যন্ত আটার স্তর ও নোংরা–দুর্গন্ধময় কাপড় চোপড় স্বচক্ষে দেখলে কোন রুচিসম্মত মানুষের পক্ষে সজ্ঞানে ঐ রুটি ভক্ষণ সম্ভব নয়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। বিস্বাদ হউক, কিন্তু পর্যাপ্ত হলে অন্ততঃ বেঁচে থাকবার উপায় হয়। যারা ফাইলের নাস্তা খায় না, এমন বন্দীদের রুটিটি পাওয়ার প্রত্যাশায় অনেক নিরীহ বন্দীকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

এক রুটিতে পেট ভরে না এমন অনেককে দেখেছি নাইট চৌকার বাবুর্চিদের কক্ষের সামনে সকালবেলা রুটি কেনার জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রয়োজনের কমতি খাবার দিয়ে বন্দীদের বাড়তি শাস্তি প্রদানের এহেন নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বড়ই মানবেতর।

www.nagorikpathagar.org

দুপুরবেলা ঃ এক থালা ভাত ও এক বাটি খেসারির ডাল। এমনিতেই নিম্নমানের চাল, তার উপর অসংখ্য পাথরকণা মিশ্রিত। বলা হয় জেলখানার ভাতে চালের চাইতে পাথরের সংখ্যা বেশি। বেখেয়ালে চিবুতে গেলে দাঁত ভাঙার সম্ভাবনা শতভাগ। ডালের অবস্থাও অথৈবচ। খেসারির ডাল, তাও ভাতের ফেন মেশানো। আমরা গরিব দেশের মানুষ বটে। কিন্তু সমাজের কোন স্তরে খাবারের মান এখনো এতটা অবনতি ঘটেছে বলে মনে হয় না। এক সপ্তাহে দুপুরে ভাত দিলে পরের সপ্তাহে দুপুরে দুইটি করে রুটি ও এক বাটি ডাল। শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্য একই বরাদ্দ। রাতে এক থালা ভাত ও এক বাটি সবজি। সবজি বলতে বোঝায় চলতি বাজারের সবচাইতে কম দামের তরিতরকারির নিরামিষ। তৈল-নুন, হলুদ-মরিচ এর বালাই নেই। এক রাতে সবজি দিলে পরের রাতে এক টুকরো ভাজা মাছ অথবা দুই-তিন পিস গরুর মাংস। মাছের কোয়ালিটি ভাল। তবে গরুর মাংসের চেহারা দেখলে কাঠ কয়লার টুকরো মনে করে ভুল হতে পারে। জেলের বড় কষ্ট, খাবারের কষ্ট। অভাগা বন্দীদের পেটে লাথি মারার এই অনিয়ম আর কতকাল চলবে জানি না। যাদের সঙ্গতি আছে তারা হয়তো কোন না কোন উপায়ে ভিন্নতর খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু নিরীহ বন্দীদের মরণ তিন বেলাতেই।

জেলে বন্দীদের খাবার চুরি হয়ে যায় ঘাটে ঘাটে। জেলের রন্ধনশালা (বড় চৌকা) হলো খাবার চুরির আখড়া। কি অদ্ভুত ব্যাপার আমার চুরি হয়ে যাওয়া খাবারের ক্রেতা আমি নিজেই। খাবার সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাট-পাহারাকে দশ টাকা করে ধরিয়ে দিলে প্রতি বেলাতেই বরাদ্দের ডবল-খানা মিলবে। জেলখানায় সবচেয়ে চড়া দামে বিক্রি হয়-পিঁয়াজ, মরিচ ও ডিম। একটা পিঁয়াজ ও একটা মরিচের দাম পাঁচ টাকা। একটা ডিমের দাম দশ টাকা। মাছ-মাংস যেদিন থাকে সে দিনকে বলা হয় ডাইটের দিন। এক ডাইট মাছ পাঁচ টাকা এবং এক ডাইট মাংস দশ টাকা। বিদেশী ওয়ার্ডের খাবার খেতে চান, কোন অসুবিধা নেই। বিদেশী ওয়ার্ডের এক বক্স ভাজির দাম ৫০ টাকা। বিদেশী বন্দীদের উপর কৃতপক্ষের নজরদারি কম বিধায় কিছু আফ্রিকান নিগ্রো কয়েদিদেরকে দেখেছি সারা জেল ঘুরে খাবারের অর্ডার নিয়ে বেড়ায়। ওদের জন্য পাকঘর আলাদা। কড়াকড়িও কম। এই সুযোগে খাবার বিক্রি করে যে বাড়তি আয় হয় তাতে ওদের বিড়ি সিগারেটের খরচ চলে। বিদেশীদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবারের মান অতোটা ভাল না হলেও খাবারের অযোগ্য নয়। তবে, সঙ্গতি আছে এমন বন্দিদের নজর ডিভিশন সেলের খাবারের উপর।

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজনীয় রুট খরচ অগ্রিম দেয়া থাকলে নিয়মিত সরবরাহ পাওয়া যায়। বাকিতে খাবার সরবরাহেরও রেওয়াজ আছে। যারা ফাইলের খাওন মোটেই খেতে পারেন না, তারা মেডিকেলের ডাক্তারের আর্দালির সাথে কথা বলে ৫০ টাকা হপ্তা মেডিকেল ডাইটের ব্যবস্থা করে নিতে পারেন।

এই নিষ্করুন অনহার-অনাচার ও দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিষহ বেদনা সওয়ার পরও জেল ফেরত মানুষগুলো মোটা-তাজা থাকে কি করে তাই নিয়ে অনেক ভেবেছি। পরবর্তীতে নিজের বন্দী-ক্লিষ্ট জীবন নিয়ে অনুধাবন করেছি। এ কোন বিশেষ ভাইটামিন এর অনুদান নয়, দুইবেলা ভাতের ফেন মেশানো খেসারির ডালের শরীরের জল ধরিয়ে দেয়ার কেরামতি মাত্র। এতদিন জেনেছি। মোটা-তাজা করনের এই ফমূর্লা পোলট্রি ফার্মের জন্তু-জানোয়ারের উপর চলে থাকে। গরু মোটা-তাজা করনের এহেন ফর্মূলা বন্দীদের উপর যেমন করে প্রয়োগ হচ্ছে, নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

আরেকটু বাড়তি খরচ করলে চৌকাতে আপনার জন্য আলাদা রান্নার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুলনামূলকভাবে ভাতের দাম সস্তা। যেদিন দুপুরে রুটি থাকে সেদিন ৫ টাকা খরচ করলেই ভাত কিনে নিতে পারেন। মোট কথা, কিছুই নেই আবার কোন কিছুর অভাবও নেই। জেলখানার খাবার দাবার নিয়ে মওলভী ফরিদ আহমদ লিখেছেন, "জেলে যে খাবার দেয়া হয় তা মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয়। মানুষ তা খেয়ে মরতে পারে না তাই বেঁচে থাকে। আইনতঃ এদের ভাগ্যে আছে অনেক কিছু কিন্তু কার্যতঃ পাওয়া যায় কোথায়? যেখানে মুক্ত আযাদ মানুষ নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত, সেখানে বন্দী মানুষ যাদের সমাজের গণ্ডির বাইরে এনে রাখা হয়েছে, তাদের অধিকারের নিরাপত্তা কোথায়?"

বড় চৌকার বাবুর্চিদের প্রতিদিন রোজগার প্রায় ৪০০ টাকা। সোলেমান নামে যাবজ্জীবন সাজার এক আসামী পানি টানার কাজ করতো ১০ নং সেলে। জেলে পানি টানাওয়ালাদের বলে জলভরি। জলভরি সোলেমান আগে বড় চৌকার বাবুর্চি ছিল। কথায় কথায় বলল–এক লাখ টাকা বাড়িতে পাঠিয়েছে বউয়ের কাছে। বাকি টাকা জুয়া খেলে ও নেশা করে উড়িয়েছে। ভাগাভাগির গণ্ডগোলে চৌকার ইনচার্জ মিয়াসাহেবের রিপোর্টে সোলেমান বাবুর্চিগিরির কাজ হারিয়েছে। বউয়ের কাছে ৫ হাজার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। ঘুষ দিয়ে আবার চৌকায় কাজ নেবে।

www.nagorikpathagar.org

নয়
মিয়াসাব উপাখ্যান

জেলখানার কথকতা লিখতে গেলে, মিয়াসাব নামের জেল সিপাইদের কথা না বললে অনেক কিছুই না বলা থেকে যায়। কারাগারের নিরাপত্তা প্রহরীদের এই অদ্ভুত নামকরণ কবে প্রথম চালু হয়েছিল তার সঠিক ধারণা পাওয়া মুশকিল। তবে মিয়াসাবদের অদ্ভুত ও কিম্ভূতকিমাকার কর্মকাণ্ড উপভোগ করার দুর্ভাগ্য যাদের হয়েছে, তারা বিনা বিতর্কে বলবেন–নামকরণটি যখনই হোক, যেভাবেই হোক–যথার্থ হয়েছে। কথিত আছে, পাক আমলে শেখ মুজিবর রহমান নাকি রসিকতা করে সিপাইদেরকে এই নামে ডাকতে শুরু করেন। সেই থেকে জেল প্রহরীরা তাদের নতুন নামকরণের যথার্থতার প্রমাণ রেখে যুগ যুগ ধরে বন্দীদের বারোটা বাজানোর কর্মটি সুনিপুণভাবেই সেরে যাচ্ছে। জেল গেইটে পা দিয়েছেন তো মরেছেন। একে তো বন্দীদশা, উপরন্তু এইসব মিয়াসাবদের উৎপীড়ন, নিপীড়ন, নির্যাতনে জীবন প্রদীপ নির্বাপিত না হলেও প্রদীপালোকের উজ্জ্বল আলোকমালা ক'দিনের মধ্যেই নিবু নিবু মাটির পিঁদিম শিখায় পরিণত হতে বাধ্য। এ আমার ঔৎসুক নয়নের সৃষ্টি ছাড়া অতিকথা নয়। হতভাগ্য বন্দীদের জীবনমানের ইতিকথা মাত্র। তবে সৌভাগ্য এই, ওদের চাহিদা কম, ওরা অল্পেতে তুষ্ট, দশ টাকায় সন্তুষ্ট।

সাক্ষাৎকার গেইটে বন্দীদের ব্যক্তিগত মালামাল গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রহরীদের যতোসব আজগুবি কাজকারবার। বৈধ মালামাল দেখলেই ওদের গা জ্বালা ধরে যায়। যতোধিক অবৈধ মালামাল ওরা ততোধিক মাত্রায় খুশি। নিষিদ্ধ মালপত্রের উপর নজর পড়া মাত্রই ওদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে মালওয়ালার পকেটের উপরে। সে কি স্থির চাওয়া, যেন হাজার বছরের কোন অনাহারী কামুকের ঈপ্সিত চাওনি পড়েছে পূর্ণ যৌবনা কোন ষোড়শীর উপর। প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির মিল ঘটলে, অপ্রয়োজনীয় সালাম ও মাত্রাতিরিক্ত আদব–কায়দা ও তোয়াজের অন্ত থাকবে না। অবৈধ মাল না এনেছেন তো আরেক যন্ত্রণা। শুরু হবে, ভদ্র–অভদ্র শ্রেণী নির্বিশেষে অন্তর্বাস হাতানোর একটা বেকায়দা রকম উৎপাত। কথিত আছে, আদালতে ফাঁসির আদেশ শুনে উন্মত্ত কান্নায় ভেঙে পড়া বিষণ্ন কোন আসামীও গেইট মিয়াসাবের বিশ টাকা না দিয়ে ঢুকতে পারেনি।

www.nagorikpathagar.org

স্থান ভেদে জেলে প্রহরীদের আচরণের ভিন্নতা লক্ষণীয়। খাতায় মিয়াসাবদের সে কি ভয়ংকর দৌরাত্ম্য। গড়পড়তা বন্দীদের আবাস খাতা এলাকায় মিয়াসাবদের হুমকি-ধমকি দেখলে মনে হবে, ওরা একেকজন মেজর জেনারেল। অল্প শিক্ষিত এসব মিয়াসাবরা অজ্ঞানতাবশতঃ প্রায়শই নিজের কর্তব্যের সীমানা লংঘন করে। এদের মেজাজ মর্জিও কাজ করে উল্টো পথে। সেল এলাকায় মিয়াসাবরা দরজার সামনে দাঁড়ালেই চা-সিগারেট ও ফলফলারী দিয়ে আপ্যায়নের রেওয়াজ আছে। ফলে, খাতার এলাকায় ডিউটি পড়লে এমনিতেই ওদের মেজাজ থাকে চড়া। পান থেকে চুন খসলেই নগদে মাইর ও putup ভীতি। খাতার ম্যাট-পাহারার সাথে মিয়াসাবদের একটা হটলাইন থাকে। কর্তব্য পালন কালে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এদের মেজাজ থাকে বেঠিক। গাঞ্জা-ভাং, হিরোইন, মারামারি, কাটাকাটির কেইস ধরতে না পারলে উৎকোচ জুটে না। ফলে, মর্জি থাকে সারাক্ষণ তিরিক্ষি। উচ্ছন্নে যাওয়া বখাটে কিশোর যেমন রাস্তায় চলতে অকারণে বাঁশের কঞ্চি হাতে রাস্তার দুধারের লতাপাতা মাড়িয়ে চলতে পছন্দ করে তেমনি খাতা এলাকায় মিয়াসাবদের দুই হাত লম্বা বেতের লাঠি বিনাকারণেই নিরীহ বন্দীদের পিঠের চামড়া দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে চলে। সেল এলাকায় অনিচ্ছায় আচরণ সংযত রাখলেও জিহ্বাটা থাকে একটু বেশি মাত্রায় বাড়তি। ডিউটি শেষে নগদ প্রাপ্তির রেওয়াজ আছে বলে অনুশাসনের চাইতে আনুগত্য প্রদর্শনেই ব্যস্ত থাকে বেশি। এরা বড়লোকের বাহন, নিরীহের দুশমন। সন্ধ্যায় লকআপের সময় বদলি আসতেই বিদায়ী মিয়াসাবের লম্বা সালাম। বিশ টাকা রেডি চাই। মধ্যাহ্ন-অব্দি যদি স্বজনের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে দেখার গেইটে গিয়ে থাকেন তা হলে দুপুরে বদলিওয়ালার পাওনা হল বিশ টাকা। তবে দিনের বেলায় এদের উৎপাত কম থাকে। রাতে মনে হয়, মিয়াসাবদের চা-সিগারেটের যোগান দেয়ার জন্যই যেন আমরা জেলে আছি। দিনের ডিউটি সকাল-বিকাল। রাতে দুই ঘণ্টা পর পর। জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান তাঁর কারা স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মিয়াসাবদের এহেন আসা-যাওয়া নিয়ে বলেছেন, "কবরবাসীদের দেখা হবে মুনকির-নকীরের সঙ্গে, এটা হাদিসের কথা। এখানে দুবেলা দুজন মুনকির-নকীর আসতো, রাতের আধারে আসতো ঘন ঘন"।

www.nagorikpathagar.org

মিয়াসাবদের উপাখ্যান লিখতে হলে আমার দ্বিতীয় কারাবাসের সহবন্দী হাজারিবাগের কালার কথা না বললেই নয়। অদ্ভুত মানুষ এক। কথার পৃষ্ঠে কথা বলা ও প্রত্যুৎপন্নমতিতে কালার জুরি মেলা ভার। সাত বছর ছিল মধ্যপ্রাচ্যে। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান তেমন না থাকলেও পার্থিব জ্ঞানের ভাণ্ডার যেন বিধাতা ওকে ভরপুর করে দিয়েছেন। গ্রেফতারের পর পত্রিকায় ওর নাম উঠেছিল পাকিস্তানী কালা। এর শানে নুযুল জিজ্ঞেস করতেই বললো–"বুঝলেন না, পাকিস্তানী নাম দিয়া থানায় ঘাড় দিওনের লাইন করছিল আর কি?" জেলখানায় আটশ মিয়াসাবের মধ্যে কালাকে চিনে না এমন সংখ্যা নেহায়েত কম। দিনের বেলা কালার বেশিরভাগ সময় কাটতো দেখার গেইটে। নিজের চোখে দেখা, জেলখানার কম-বেশি আট হাজার বন্দীর মধ্যে একমাত্র কালাই বিনা স্লিপে হরহর করে দেখার গেইটে চলে যেতে পারতো বিনা বাধায়। অনেক রাজনৈতিক বন্দী ও টপটেররকে দেখেছি, গেইট হতে রিস্কি মালামাল বহন করতে কালার উপর নির্ভরশীল হতো। সকলের সেবায় নিয়োজিত কালার দিনমান গেইটে যাতায়াত ও মিয়াসাবদের দফায় দফায় উৎকোচ প্রদানের কারণে মিয়াসাবদের ওপর ছিল ওর ব্যাপক প্রভাব ও প্রচুর জনপ্রিয়তা। কালাকে দেখলেই দশহাত দূর থেকে সেলামির প্রত্যাশায় সেকি লম্বা লম্বা সালাম, প্রাণহারা হাসি! কালাও এক আজব মানুষ। সাফ জবাব "হাইস্যেন না, ট্যাকা ছাড়াতো কথা কন না।" যেসব মিয়াসাব ক্যারাব্যারা করতো তাদের ওপর কালার সেকি জারি-জুরি, "তোর নম্বর কতো? কয়দিন অইল ঢাকা জেলে আইছস? ব্যাটা চিনছ আমারে? আমরা লালবাগের পোলা। জেলডাইতো আমগো জায়গার উপরে। বেশি ক্যারাব্যারা করলে, গেইটের বাইরে পাইলে কানের লত্তি কাইট্যা রাহুম কইলাম"। মিয়াসাবরাও ওকে কখনো বন্ধু, কখনো ভাল দেনেওয়ালা ঠাওর করে চলাচলের সহজ ব্যবস্থা করে দিত। সত্যি, দুঃসহ জেলজীবনকে সহনীয় করে নেয়ার সকল কায়দা-কানুন কালা আত্মস্থ করে নিয়েছে। জেলটাই যেন ছিল ওর বাড়িঘর। ওর কথা একটাই, "টাকা দিবেন দুইশ, মাল কি দিলেন দ্যাহনের টাইম নাই। বুঝলেন না, ওগো নজরতো পকেটের দিকে, ব্যাগে কি আছে হেইদিকে খবর নাই।"

কারারক্ষীদের আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা করা বড় মুশকিল। কখনো বন্ধু, কখনো শত্রু। এই ভাল, এই খারাপ। এরা না থাকলেও চলে না, থাকলেও উৎপাত। কারাগারে এমন কোন অনিয়ম, দুর্নীতি নেই যার সাথে মিয়াসাবদের

www.nagorikpathagar.org

যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওদেরও কিছু সুখ-দুঃখের বিষয় আছে। মিয়াসাবদের চাকুরিকে বলা হয় কচু পাতার পানি। এই আছে, এই নাই। উপরওয়ালার রিপোর্ট হলেই চাকুরি নিয়ে টানাটানি। অবশ্য যতো কঠিন নিয়ম–কানুন ওদের পয়সার আমদানি ততো বেশি। ডিটেনশন, দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ, যোগাযোগের উপযুক্ত বাহক পাওয়া যাচ্ছে না–ডাক গাড়ির সাহায্য নিন। মুশকিল আসান। বিশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে টেলিফোন নম্বর দিয়ে দিবেন। যথাযথ ম্যাসেজটি পৌঁছে দিয়ে পরদিন ফলোআপ সংবাদটা আপনাকে জানিয়ে যাবে। ঢাকা শহরে কাউকে চিঠি দেওয়ার দরকার হলে ভাড়ার সাথে বাড়তি একশ টাকা দিবেন, চিঠি নির্ভুল জায়গায় সঠিক ব্যক্তির হাতে পৌঁছে যাবে। অন্ততঃ আমাদের জিপিওওয়ালাদের লক্করঝক্কর মার্কা গ্যারান্টেড মাধ্যমের চাইতে এই ডাকগাড়ির গতি ও নিশ্চয়তা যে বেশি, এতে জেল খাটিয়ে যে কেউ আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন না। মুশকিলও আছে। ছাড়া পাওয়ার পর দেখবেন কদ্দিন বাদে বাদেই মিয়াসাব যেয়ে আপনার বাসা বাড়িতে হাজির; বকশিশ চাই। নগদ টাকা-পয়সা রাখা সমস্যা, মিয়া ব্যাংকের সাহায্য নিন। সার্ভিস চার্জ দিলে মিয়াসাবরা সযতনে আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখার নিরাপদ ব্যাংক হিসাবে ব্যবহৃত হবে। জেলখানার ছোটখাটো সকল অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এই জেল সিপাইরা। প্রত্যেক ভবনের গেইটে গেইটে ডিউটিরত মিয়াসাবকে একশলা করে সিগারেট ধরিয়ে দিলে নিয়মের তোয়াক্কা না করে আপনি পুরা জেল চত্বর ঘুরে বেড়াতে পারবেন। জেল কোডের বিধান মতে, তিনটির বেশি মামলা থাকলে ডাণ্ডাবেড়ি পরতে হবে। ওখানেও দুর্নীতি। পর্যাপ্ত টাকা ঢাললে ডাণ্ডাবেড়ির বালাই নেই। মওলভী ফরিদ আহমদ তার 'কারাগারের সাতাইশ দিন' বইয়ে মিয়াসাবদের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন, "ওরা সবকিছুতেই দোষ দেখতে পায়। তা ছাড়া নিজের কর্তব্যের সীমা কতখানি বুঝতে না পেরে প্রায়ই সীমা লঙ্ঘন করে থাকে"। বর্ষিয়ান নেতা পংকজ ভট্টাচার্য তার কারা স্মৃতিতে বলেছেন, "কারাগারে কাউকে চারটি কলা দেয়া হলে পুলিশ তিনটে খেয়ে একটি পৌঁছে দিবে"।

সকল সিপাই একই ধাঁচের, এমন কথাও ঠিক নয়। রাজনৈতিক কর্মী বলে, ভালবেসে আমাদের জন্য নিজ বাড়ি থেকে পিঠা চিড়া তৈরী করে এনেছেন এবং চাকুরি হারানোর ভয়কে উপেক্ষা করে বিনা লাভে আমাদের কাজকর্ম করে দিয়েছেন এমন মিয়াসাবের নজিরও আছে। শহীদ মিয়াসাবের ডিউটি পড়লে তো ঐ এলাকায় সেদিন থাকতো খুশির দিন। তাছাড়া,

www.nagorikpathagar.org

মিয়াসাবরা নিয়ম মাফিক ডিউটি করলে গড়পড়তায় বন্দীদের জেলজীবন যে দুর্বিসহ হয়ে উঠতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিয়াসাবরা সকল সময় এই অল্প ক'টা টাকার লোভেই এতোসব অনিয়ম দেখেও দেখে না, এমন নয়। শুধুমাত্র এক কাপ চা ও একটি সিগারেটের জন্যে সেল এলাকায় নিশিরাতে এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে নিরন্তর ফুট-ফরমায়েশ খাটে, এমন কথা বলাও অন্যায় হবে। মোটকথা, বন্দী ও কারারক্ষী একে অপরের বন্ধু। পরস্পরের প্রয়োজনের নিমিত্তেই গড়ে উঠে এই পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। ফলশ্রুতিতে, ভাল থাকে দু'পক্ষই। তবে, দু'একজন আছেন বড়ই কাটখোট্টা। ডাকলেই ক্ষেপে যায়। জেলের ভাষায় এদের বলে, পল্টিবাজ মিয়াসাব। দিনবদলের পালায় বিলাতি সম্রাজ্যের রেখে যাওয়া পুরানো জেল বিধানই যখন পাল্টানো গেল না, তখন কারা প্রশাসনের এই ছোটখাটো নিম্নবেতনভুগী কর্মচারীদের ব্যক্তি বিশেষের এহেন দোষত্রুটি আমার কাছে খুব একটা মুখ্য বিষয় বলে বিবেচিত হয়নি। তবে, এ জাতীয় সিপাই বরকন্দাজের আচরণ যে শিষ্টাচার ও ভব্যতা বিবর্জিত, এ কথা বলা অন্যায় হবে না।

আমার দ্বিতীয় কারাবাসের পয়লা রাতে এমন একজন পল্টিবাজ মিয়াসাবের পাল্লায় পড়ে সেকি বেহাল অবস্থা! এতগুলো জুনিয়র সহকর্মীর সামনে আমার অপমানের অন্ত রইলো না যেন। মিয়াসাব মহাশয়ের নাম শরীয়ত উল্লাহ। পদে কনস্টেবল। হুমকি-ধমকি ও চলন-বলনের কায়দা-কানুনের বাহার দেখে কিছুতেই পদমর্যাদা ঠাওর করে উঠতে পারছিলাম না। রমজান মাস। সেহেরী না খেয়ে রোজা রাখা যায় না, এমন নয়। কিন্তু সহবন্দী খালেকের প্রেয়সীর দেয়া ভাত-তরকারী সাথে এনেছিলাম বলেই গোলটা বাঁধল। বিশ টাকা অফার করতেই ভীষণ মাইণ্ড করলেন। আসল গণ্ডগোলটা বাঁধল তখন, যখন আমি মাতৃভাষা ছেড়ে দু'চার বাক্য ভিনদেশী ভাষা বলতে শুরু করেছিলাম। আর যায় কোথা। মিঃ শরীয়ত উল্লাহ্ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। তল্লাশী না করে আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না, বাড়তি টাকা দিলেও না। চেক করে আমার কাছ থেকে সাতানব্বই টাকা উদ্ধার হলো। বলা হলো, বিচারের জন্য পরদিন সকালে আমাকে কেইস টেবিলে সোপার্দ করা হবে। আমরা কেমনতর ছাত্রনেতা, কি শিখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝে আর কথা বাড়ালাম না। শত শত ঔৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে যেন আমার আর লজ্জা করবারও অধিকার ছিল না। শরমের একটা অনাকাঙ্খিত মুখাবরণ যেন নিমিষে দিগন্ত বিস্তৃত করে কুৎসিত লজ্জায় আমার আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে দিল। এতটুকু মান বাঁচাতে গিয়ে এমন করে যে লজ্জার পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে, ঘুর্ণাক্ষরে তা ভাবি নাই। ঠাট বজায় রাখতে, ওষ্ঠাধরে একটা বিষাক্ত হাসির অতিসূক্ষ্ম আভাস টেনে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমদানিতে ঢুকে গেলাম। সাত সকালে আরেক দফা অপদস্থ হওয়ার

www.nagorikpathagar.org

জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচালাম তখন, যখন ডাকসাইটে শরীয়ত উল্লাহ্ মাঝরাতে গেইটের কাছে এসে কানে কানে জানতে চাইলো, এই টাকার উপর আমার কোন দাবি আছে কিনা? বুঝলাম, ওর পকেটস্থ হলে আমার ঝামেলা থাকে না। অনুমান হলো, শরীয়ত উল্লাহর এতোসব হুমকি–ধমকি জেলখানার ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, অতিমাত্রায় ঘুষ আদায়ের অপকৌশল মাত্র।

বিধাতা সকলকে সমান করে তৈরী করেন নাই। তাই আদম সুরৎ নিয়ে কথা বলাও সঙ্গত নয়। তারপরও মানুষে মানুষে ভেদ প্রভেদ থাকে। চলনে বলনে, চাহনিতে এই ভিন্নতা স্পষ্ট। এমন কিছু মানুষ আছে যাদের চেহারাতেই একটা ছোকছোক ভাব ও ছ্যাঁচরামীর ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এমন একজন কারারক্ষীর নাম তবারক। ওকে দেখলেই আমার ভীষণ রাগ হতো। রমযান মাসের শেষের দিক। ইফতারীর আয়োজন চলছে। জেলখানায় কাটাছেঁড়ার কাজ হয় খণ্ড টিনের টুকরা দিয়ে। জেলের ভাষায় বলে কাটনি। হঠাৎ কোত্থেকে তবারক এসে হরহর করে রুমে ঢুকেই কাটনিটি পকেটে ভরে রওনা হলো। অনেক বলে কয়ে, অনুনয় বিনয় করেও কোন কাজ হলো না। তবারকের এক কথা "রমজান মাস। সরকারের বেতন খাইয়া সরকারের সাথে নিমকহারামি করা যাইব না"। কথা শুনে মনে হচ্ছিল, বাকি এগার মাস সরকার ওকে একচেটিয়া নিমকহারামির লাইসেন্স দিয়ে ধন্য হয়েছে। কি আর করা। পিন্টু ভাইয়ের শরণাপন্ন হতে হলো। রাজনৈতিক পরিচিতি, পুরানো ঢাকার আঞ্চলিক প্রভাব ও দেদারছে টাকা খরচের সুবাদে মিয়াসাবদের উপর পিন্টু ভাইয়ের ছিল ব্যাপক প্রভাব। কোন কথা নেই, পিন্টু ভাই এসেই যথারীতি মিয়াসাবের পকেটে হাত ঢুকিয়ে জোর করে কাটনি বের করে নিলেন। সন্ধ্যায় লকআপের পর এসে তবারক হাজির। বোঝা গেল, কাটনি ফেরত নিয়ে নেওয়ায় তবারক ওর পাওনা নিতে এসেছে। বিশ টাকা পেয়ে ভীষণ নাখোশ। পঞ্চাশ টাকা চাই। কম্বলের ভিতর থেকে মাথা উঁচু করে পিন্টু ভাই আড়চোখে তাকাতেই তবারক পগার পাড়।

জানুয়ারীর আঠারো তারিখ ২০০০। নিত্যদিনের অভ্যাস মতো সাত সকালে ট্র্যাকস্যুট পরে দশ সেলের বাগানে পায়চারী করছিলাম। বাগানের দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে নতুন দালান। ওখানে থাকতো আমার কেইস পার্টনার বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র সহকর্মী জুয়েল, সালাম, সংগ্রাম, বাবলু, আজিজ, কবির ও গাইবান্ধা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সোহেল। তিন তলার জানালা হতে ওদের দম ফাটানো ডাকাডাকি উপেক্ষা করতে না পেলে সন্তর্পনে হাজির হলাম নতুন দালানের ফটকে। জেলখানায় নিজের ভবন ছাড়া অন্যত্র চলাচলের বিধান নেই। নিয়মের এই বিধান পালিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও বোধ করি নেই।

www.nagorikpathagar.org

শিশির স্নিগ্ধ শীতের সকাল। বাতাসে বসন্তের আগমনী গান। পূর্ব দিগন্তের লালাভ সূর্যরশ্মি সবেমাত্র দিগন্ত বিস্তৃত করে একটি চমৎকার দিনের সূচনা করেছে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে দূরের নিরাপত্তা চৌকির দিকে তাকিয়ে অবচেতন মনে কি যেন ভাবছিলাম। চৈতন্য ঘটলো তখন, যখন নতুন দালানের ইনচার্জ মিয়াসাব হারুন মিয়া হাতের বেত্র দণ্ড আমার পৃষ্ঠদেশে ঠেকায়ে হালকা গুঁতো মেরে উচ্চস্বরে বলে উঠলো, 'এই তুই কেরে?' কথাটা এমন বেয়াড়া ও বিশ্রী শুনালো যে, উপস্থিত সহকর্মীরা লজ্জায় মুখ নত করে ছি ছি করতে লাগলো। আর বাকিরা চোখ টিপে দাঁত বের করে হো হো হাসতে লাগলো। আর আমি লজ্জা শরমের অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠে হাসি মুখে বললাম, "তা ভাই এই তুই তোকারী করার বদ-অভ্যাসটা কি জেল কোডেই লেখা আছে? অবস্থা বেগতিক দেখে, মিয়াসাব মিহি সুরে বললো, "এইড্যা কিছু না। দেখেন না, ইংরাজীতে তুই, তুমি আপনি সব কয়টার জন্য 'ইউ' বললেই চলে। জাতি ও ভাষাভেদে সম্বোধন সংস্কৃতিরও যে ভিন্নতা আছে, বয়স, শিক্ষা ও বিত্ত-বৈভব যে কখনো কখনো সম্বোধনে ভিন্নতা আনে সেটা বোঝার মতো শিক্ষা ওদের নেই। একথা মনে করে, বসমুতি যেমন তার অন্তরের দুর্জয় অগ্নুৎপাত সহ্য করে, ঠিক তেমনি অবিচলিত মুখে সমস্ত সহ্য করে সন্তর্পনে দশ সেলে ফিরে এলাম।

মিয়াসাব বাহাদুরের নাম কুদ্দুস। সবাই ডাকতো ব্রিগেডিয়ার কুদ্দুস বলে। অকারণ হুমকি-ধমকি ও অনিয়ন্ত্রিত চলন-বলনের জন্যই নাকি ওর এর এই অদ্ভুত নামকরণ হয়েছিল। ভারী ভোজন বিলাসী। মুখরোচক খাবার দেখলে ওর মাথা ঠিক থাকে না। ওর আরজি আবদারে সকলে ত্যক্ত-বিরক্ত। সেল এলাকায় বন্দীদের একটা ঐকমত্য হলো, কুদ্দুসকে কি করে হেনস্তা করা যায়। মিরপুরের ডাকাতি মামলার আসামী আক্তার তখন থাকে বিশ সেলে। সিদ্ধান্ত মতো, আক্তার বিড়াল জবাই করে রান্নাবান্না করে চামড়া রেখে দিল পলিথিনের ব্যাগে। ব্রিগেডিয়ার কুদ্দসের ডিউটি। নীরব হোটেলের পরাটা-মাংস মনে করে, পেট পুরে খেয়ে মিয়াসাব যখন তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে, তখনই চারদিক থেকে হৈ-হুল্লোড় আর দম ফাটানো হাসি। বিড়ালের চামড়ার ব্যাগটি সামনে এনে ধরতেই কুদ্দুস মিয়াসাবের অনর্গল বমি, মর মর অবস্থা। সেই থেকে কুদ্দুসকে দেখলেই আড়াল আবডাল হতে কেউ না কেউ ম্যাঁও শব্দে ডেকে উঠতো। আর কুদ্দুস তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতো। এইসব পল্টিবাজ মিয়াসাবদেরকে মুখ্যা ও কাউয়া বললে ভীষণ রকম ক্ষেপে যেতো।

www.nagorikpathagar.org

দশ

কয়েদিদের জীবনকথা

জেলখানার বদ্ধভূমিতে যা দেখেছি সকলই আশ্চর্য ঠেকেছে। আগাগোড়া সকল কিছুতে দুর্নীতি আসন গেড়েছে শক্তভাবে। সবকিছুতেই দুর্নীতির মহামারী চলছে যেন। কম্বল থেকে পশম বাছাই করলে যেমন কম্বলের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি দুর্নীতির কথা বলতে গেলে জেলের ভিতর এমন কিছু পাওয়া যাবে না যাতে দুর্নীতির ভাইরাস ঢুকেনি। এতোসব দুর্নীতির প্রধান সহায়ক হলো বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিরা।

সীমাহীন অত্যাচার, নির্যাতনের পরও জেলখানা চলছে। কোথাও কোন স্থবিরতা নেই। করপোরেশন কিংবা সংস্থার মতো দুর্নীতির কারণে সার্বিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, জেলার থেকে শুরু করা জেল সিপাই পর্যন্ত সকলেই কয়েদিদের ঘাড়ের ওপর পা রেখে মজা লুটে যাচ্ছে। শাস্তি রেয়াতের প্রত্যাশায় দিন-রাত খেটেখুটে ওদের দুর্নীতির খেসারত দিয়ে যাচ্ছে অভাগা কয়েদিরা। ওদের সকলের চেয়ে বেশি পরিশ্রম, বেশি অসম্মান। ওরা বড়বাবুদের অপকর্মের বাহন। কর্তৃপক্ষের কেনা গোলাম। জেলখানা সংশোধনাগার হলেও কয়েদিদের মানুষ হবার কোন আয়োজন জেলে রাখা হয়নি। বড় সাহেবদের পদসেবা ও অর্থের যোগান দেয়ার জন্যই যেন আদালত ওদের শাস্তি দিয়েছে। শাস্তি মওকুফের বিষয়টিকে জেলের ভাষায় বলে মার্কা পাওয়া। মার্কা হারানোর ভয়ে কয়েদিরা এই দাসত্বকে আশীর্বাদ মনে করে মাথায় তুলে নিয়েছে।

জেল ট্রান্সফার বলে একটি বিষয় আছে। জেলের ভাষায় বলে চালান। কোন কয়েদি তার ব্যক্তিগত কারণে জেল ট্রান্সফার চাইতে পারেন। আবার কর্তৃপক্ষ যে কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে চালান করে দিতে পারেন। এখানে সমস্যা উভয়মুখী। স্বেচ্ছায় জেল বদলের দরখাস্ত করবেন, টাকা না দিলে হাজার বছরেও পাস হবে না। আবার আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালানের অর্ডার হয়েছে, টাকা না ঢাললে ফিরানোর কোনই বিকল্প পথ নেই। অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল কোন কয়েদি টাকার জোরে যদি কয়েদির পোষাক পড়তে না চান, তাও সম্ভব। যেমন– চৌদ্দ বছরের সাজাপ্রাপ্ত মি. খানকে কখনো কয়েদির পোষাক পরতে দেখিনি। যদি কেউ ভাল মানের কাপড় দিয়ে ইচ্ছামতো মাপ ও ডিজাইনের কয়েদি পোষাক বানিয়ে নিতে চান তারও ব্যবস্থা আছে। MD (ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপার্টমেন্ট)-এ প্রতি সেট পোষাকের মূল্য ৩০০ টাকা।

www.nagorikpathagar.org

জেলখানায় নিয়মের চাইতে জেলারের ইচ্ছা অনিচ্ছাটাই বড়। বৃটিশদের সময় বলা হতো জেল যত বড়, জেলারের বাড়ি হবে তত বড়। এখন সে রকম না থাকলেও জেলারই যে জেলের ঈশ্বর কথাটি মিথ্যা নয়। ফলে, নির্যাতিত কয়েদিদের আক্রোশের জের পড়ে হাজতিদের ওপর। এতে হাজতিদের হয়েছে মরণ-জ্বালা। কথায় কথায় মাইর-গুঁতা। নয় থেকে ছয় হলেই শারীরিক নির্যাতন, putup ভীতি ও ঘুষ প্রদানের অহেতুক যন্ত্রণা।

তখন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা চলছে। ঢাকা জেলের কেইস-টেবিলের সকল রাইটার ব্রাজিলের সমর্থক। ব্রাজিল হেরে যাওয়াতে শুরু হলো এক লঙ্কাকাণ্ড। বিভিন্ন সময়ে নানা অজুহাতে রিপোর্টেড সকল হাজতিকে স্লিপ করে এনে কেইস টেবিলের বারান্দার খুঁটির সাথে বেঁধে শুরু হলো গণধোলাই। মানুষ পিটানোর সেকি বিচিত্র খায়েশ! সমর্থিত দল হেরে যাওয়ার দুঃখ বেদনাকে প্রশমনে এই বর্বরতা দীর্ঘমেয়াদী সাজার কয়েদিদের মানসিক বিকলতাকেই প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, যে কোন নির্যাতনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের শতভাগ ক্লিয়ারেন্স থাকে। ফলে ক্ষমা কয়েদিদের চরিত্রে পুরোপুরি অনুপস্থিত। অত্যাচারে, নির্যাতনে বন্দীদেরকে মৃত্যু অব্দি নিয়ে যাওয়া এদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার। নির্যাতনের কায়দা-কানুনে এরা আধুনিক যন্ত্রপাতিতে বিশ্বাসী নয়। দুটো হাতই তারা মনে করে যথেষ্ট। আর এ দুটি হাতই ব্যবহারের ভিন্নতায় কর্তৃপক্ষের কাছে কি রকম মর্যাদায়ই না পায়। শুনেছি, নির্যাতনে কোন বন্দী মৃত্যুবরণ করলে, কর্তৃপক্ষ লাশ দেয়ালের বাইরে ফেলে দিয়ে পাগলা ঘন্টা বাজিয়ে সারা জেলে প্রচার করে দেয় যে, জেল এস্কেপ করতে গিয়ে মারা পড়েছে। আর সত্যি সত্যিই যদি কোন বন্দী জেল থেকে পালিয়ে যায় এবং প্রচার মাধ্যমে ধরা না পড়ে, তাহলে কর্তৃপক্ষ চাকরি বাঁচানোর তাগিদে বাইরে থেকে চুক্তিভিত্তিক একজনকে ধরে এনে হিসাব মিলিয়ে রাখেন। অতি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়া লোকটির নামে স্বীয় উদ্যোগে কোর্ট থেকে জামিন করিয়ে নেন এবং কাগজেপত্রে খালাস দেখিয়ে দেন। বিষয়টির সত্যতা কত দূর জানিনে, তবে জেলখানায় এসব কাহিনী বন্দীদের মুখে মুখে। যা রটে, তার কিছুটা হলেও সত্যিতো বটেই।

জেলখানায় নিরাপত্তা প্রহরী ছাড়া অন্য কোন স্টাফ নেই বললেই চলে। সকল কাজই চলে কয়েদিদের দ্বারা। সশ্রম দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিদের বিভিন্ন কাজে দফাওয়ারী ভাগ দেয়া হয়। মাইকেল মধুসূদনের নিজস্ব কিছু শব্দকে যেমন বলা হতো মাইকেলী শব্দ, তেমনি জেলখানায়ও কিছু বিশেষ শব্দ চালু আছে যেগুলোকে বলা যায় জেলের ভাষা। যেমন– পানি টানার লোককে বলে

www.nagorikpathagar.org

'জলভরি' বা 'জলপরি'। সুইপারের কাজকে বলে 'বন্দুক দফা'। ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপার্টমেন্টকে সংক্ষেপে বলে এম.ডি. দফা। বন্দীদের ব্যবহৃত থালা, বাটি, কম্বল থেকে শুরু করে কয়েদিদের পোষাক প্রতিটি জিনিসই জেলের ভিতরে তৈরি হয়। কয়েদিরা দিন রাত শিফটিং ডিউটি করে নিজেদের জীবন ক্ষয় করে এম.ডি. দফার মিলের চলন শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছে। শুনেছি, বিদেশ বিভুঁইয়ে কয়েদিদের কিছুটা শ্রমের মূল্য দেয়া হয়। ঢাকা জেলে শ্রমিকের শ্রমের মূল্য তো দূরের কথা, ঠিক মতো খাওনটাই দেওয়া হয় না। বয়সে বৃদ্ধ, চুল পাকা কয়েদিদের বানানো হয় মাছির কল বা মাছি দফা। এক বর্গফুট পরিমাণ ছালার ওপর এক চিমটি গুড় ছিটিয়ে ঝাড়ু হাতে বসে থাকে। ওদের কাজ মাছি মারা। শিক্ষা-দীক্ষা আছে, দেখতে ভাল এমন কয়েদিদের কাজ পাস হয় কেইস টেবিলে। কর্তৃপক্ষ, কয়েদি ও হাজতিদের মধ্যে ঘুষ দেয়া-নেয়ার সার্বিক বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয় ঐ কেইস টেবিলকে ঘিরে।

কেইস টেবিলের চীফ রাইটারের কাজটি অত্যন্ত লোভনীয়। এক সময় ঢাকা কারাগারের চীফ রাইটারের মাসিক রোজগার ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি। জেলের চীফ রাইটারগিরি কাজ করে এয়ারপোর্টে দশ লাখ টাকায় দোকান কিনেছে এমনও দৃষ্টান্ত আছে। বর্তমানে চীফ রাইটারের দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। চীফ রাইটার আনিসের কথা আগেও বলেছি। বেশ চৌকস ছেলে। ইচ্ছা করেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলি অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ড ও সেলের ম্যাট-পাহারাদের নিয়ন্ত্রণ শুধু ওর কাছে। এতে যা পায় হয়তো ওর নিজের ভালই চলে। কে কোথায় কাজ পাবে, সেই কামপাসের (work permit) দায়িত্বে আছে কালিগঞ্জের ইমদু হত্যা মামলার আসামী ইমরান। আঠার বছর হলো জেলে আছে। জুঁতসই জায়গায় কামপাসের জন্য কয়েদিদের দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। শুনেছি, এর অংশ হিসাবে ইমরানের যা রোজগার হয়, তাও মাসে দশ হাজার টাকার কম নয়। আলাপচারিতায় ইমরানকে একজন পরিবর্তিত মানুষ বলেই মনে হয়েছে। ফাইল কাটার দায়িত্বে আছে আদমজীর শ্রমিক নেতা সিদ্দিক সরদারের ছেলে রহিম। বন্দীরা ইচ্ছামতো ওয়ার্ড বা সেলে যেতে চাইলে তিনশ থেকে পাঁচ-দশ হাজার টাকা ঘুষ প্রদানের রেওয়াজ আছে। যে কোন বন্দীর ওয়ার্ড পরিবর্তনের চার্জ ২০০ টাকা। উল্লেখিত দায়িত্বগুলো ঝুঁকিপূর্ণ এই জন্য যে, বন্দীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের পারঙ্গমতা না থাকলে কর্তৃপক্ষ তাকে এই দায়িত্বে বেশি দিন রাখতে চান না। আবার কোন কোন সময় বড় বাবুদের সাথে ভাগাভাগির প্রশ্নে জটিলতা দেখা দিলে কামপাস বাতিল করে

www.nagorikpathagar.org

পানিশমেন্ট সেলে বন্দী করে রাখ হয়। আমার দেখা মতে, রহিমকে একবার পনের সেলে আটক করা হয়েছিল। শুনেছি, দুই হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে কামপাস ফিরে পেয়েছে। কানে দুল পরা সুদর্শন যুবক রহিম সাত বছর জেলে আছে। এতদিনে হয়তো ও মুক্তি পেয়ে থাকবার কথা। তবে অত্যাচার, নির্যাতনে ছেলেটি বেশ সিদ্ধ হস্ত।

জেলে কয়েদিদের মধ্যে জুয়া খেলার ব্যাপক সংক্রমণ ঘটেছে। এতোসব আয়-রোজগারের টাকা পয়সা দিয়ে কেউ উন্নতি করতে পেরেছে এমন ঘটনা বিরল। সোলেমান বলল, 'স্যার লম্বা সাজা, জুয়া না খেললে, নেশা না করলে বাঁচুম কেমনে।' কয়েকদিদের মধ্যে সবচেয়ে নোংরা বিষয় বিকৃত যৌন লালসা। প্রায়শই দীর্ঘদিন জেলে থাকা কয়েদিদের আক্রমণের শিকার হয় কিশোর বন্দীরা। এই জন্য শিশু ওয়ার্ডকে সবসময়ই বাড়তি প্রটেকশনে রাখা হয়। জেলের ভাষায় এই নোংরা বিষয়টিকে বলে ছোকড়াবাজি। ছোকড়াবাজিতে ধরা পড়ায় বিভিন্ন সময়ে অনেক কয়েদিকে পানিশমেন্ট সেলে অন্তরীণ রাখার দৃষ্টান্ত আছে। কিংবদন্তী নেলস ম্যান্ডেলা তার জীবনের সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী অর্জন করেছেন রবনি আইল্যান্ডের কারাগারে বসে। নিজের চোখে দেখেছি, ম্যান্ডেলা কারাগারের যে কক্ষটিতে জীবনের ছাব্বিশটি বছর কাটিয়েছে তাতে আর যাই হোক শিক্ষার আয়োজন ছিল। আমাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে দির্ঘমেয়াদী কয়েদিদের শিক্ষা গ্রহণের কোন আয়োজন রাখা হয়নি। এই অফুরন্ত সময়ে কয়েদিদেরকে লেখাপড়া করে কাটিয়ে দিতে আগ্রহী করে তোলার কোন পরিবেশও এখানটায় নেই। নেই কোন পরিকল্পনাও। ঢাকা কারাগার থেকে লেখাপড়া করে মানুষ হয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে এমন নজিরও বোধ করি নেই।

www.nagorikpathagar.org

এগার

প্রেম-পরিণয়, বিরহ-বিচ্ছেদ

জেলখানায় প্রেম-পরিণয়, বিরহ-বিচ্ছেদ, স্বপ্ন আর স্বপ্ন ভঙ্গের জানা অজানা কত যে উপাখ্যান, কল্পকাহিনী চালু আছে, এই অল্প পরিসরে তার খতিয়ান দেয়া সম্ভব নয়। জেলবন্দী হয়েছে এই অভিযোগে বিয়ের পাকা সম্বন্ধ ভেঙ্গেছে, অনেক তরুণ হারিয়েছে তার ভালবাসার মানসীকে। আবার বন্দী জীবনের দুর্বলতার সুযোগে অনেক যুবতী জয় করে নিয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত যুবকের মন। জেল গেইটে কাজী ডেকে বিয়ে হয়েছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। আবার নিজের চোখে দেখেছি বিবাহ-বিচ্ছেদের বিয়োগান্তক ঘটনা, ভালবাসার ঘর ভাঙ্গনের করুণ বিলাপ। শুনেছি, কেমন করে দীর্ঘমেয়াদী কয়েদিদের বউ ঘর ছেড়েছে, দ্বি-চারিণী হয়েছে জেনেও সন্তান-সন্ততির লালনের নিশ্চয়তায় কেমন করে নষ্ট নারীর সংসার অবলীলায় মেনে নিচ্ছে।

ষাটের দশকের গোড়ার কথা। বিয়ের পিঁড়িতে বসার পাঁচদিন আগে গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করলেন আজকের প্রাজ্ঞ রাজনীতিক, সাবেক মন্ত্রী, সে দিনের তরুণ রাজনৈতিক কর্মী আনোয়ার জাহিদ। জনাব আনোয়ার জাহিদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, জেলখানায় থাকতেই ওনার বিয়ে হয়। কনেকে জেল গেইটের বাইরে রাখা হয়, জেলের ভিতরেই অনুষ্ঠিত হয় বরের গায়ে হলুদ। জেলার মহোদয় নাকি পাগড়ি-শেরওয়ানীর ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। এমন একটি ভিন্ন রকম বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জহুর আহমেদ চৌধুরী। পোড়া কপালে, শনির দশা, দুর্ভাগা-এই ধরনের সংস্কারের কারণে জনাব আনোয়ার জাহিদের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল কিনা জানি না। তবে এমন ঘটনার কঠিন বিরহে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল সেলে দিনমান ধরে উচ্চস্বরে প্রিয়ার নাম জপতে দেখেছি একাধিক তরুণকে।

পদ্মাপাড়ের ছেলে হাসান। বাড়ি ঢাকার দোহারে। বিয়ের আসর থেকে গ্রেফতার হয়েছে। অনেক চেষ্টা তদবির করে মধ্যপ্রাচ্যে একটা চাকরি যোগাড় করেছিল। বিয়ের পরদিন ছিল বিমানের ফ্লাইট। ওর সাধনার সোনার হরিণ মধ্যপ্রাচ্যের চাকুরি ও ভালবাসার বিয়ে দুই-ই গেল। শুনেছি, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে শাসক দলের এক প্রভাবশালী নেতা পুরানো মামলায় গ্রেফতার করিয়েছে। কনে পক্ষ বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে অন্যত্র বিয়ে ঠিক করলো। ভালবাসার টান মানুষকে কত কিছুই না করতে শেখায়। অবাক কাণ্ড! বিয়ের আসর থেকে ওর

www.nagorikpathagar.org

এক বন্ধুর সহযোগিতায় মেয়েটি পালিয়ে এসেছে সরাসরি জেল গেইটে। হাসানকে বলেছে ও অপেক্ষায় থাকবে, যদ্দিন না হাসান মুক্তি পায়। সেই থেকে হাসান কষ্টের প্রহর পার করছে মুক্তির প্রতীক্ষায়। মানসীর প্রত্যাশায়। দ্বিতীয়বার কারাগারে এসে শুনেছি হাসান মুক্তি পেয়েছে। কামনা করি, স্রষ্টা ওর মঙ্গল করুক।

দেখার গেইটে, বউয়ের তরফ থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্য প্রায়শই ঘটে। আবার কল্পনা ভাবীকে দেখেছি, বিবাহ বার্ষিকীর দিন সাত সকালে বিমোহিত গোলাপ গুচ্ছ হাতে জেল গেইটে নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে প্রিয়জনের দিকে, বাহারি আহার ও নতুন পোষাক সঙ্গে করে। দীর্ঘমেয়াদী সাজার দুঃসহ যন্ত্রণার ভার সইতে না পেরে মানসিক বৈকল্য ঘটে পাগল সেলে আটকা পড়ার নজিরও আছে। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট করে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার মাধ্যমে মুক্তির পথ বেছে নিয়েছে, এমন ঘটনাও কম নয়। ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার কথা বলি। কয়েদির নাম পাখি। অনেক দিনের সাজা। দুই বছর পর বউ এসে জানিয়ে গেল, সে অন্তঃসত্ত্বা। পাখি এখন পনের সেলে থাকে। দুঃখে, ক্ষোভে, ম্রিয়মান পাখি এই কষ্টের যন্ত্রণা সইতে না পেরে নিজের ওপর প্রতিশোধ নিল। একটি নতুন ব্লেড দিয়ে নিজের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলল। পরে ওকে চালান করে দেওয়া হয় অন্য জেলে। পিন্টু ভাইয়ের সাথে পাখির দেখা কুমিল্লা সেন্ট্রাল জেলে।

জেলখানায় আরেকটি মর্মান্তিক বিষয়– প্যারোলে মুক্তি। বড়ই বেদনাদায়ক, ভীষণ কষ্টের। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি। প্রথম দিকটায় বন্দীরা মুক্তির সনদ মনে করে আনন্দে নেচে ওঠে। খানিক পরেই অনুধাবিত হয়, এ মুক্তি চিরতরে হারিয়ে যাওয়া স্বজনকে শেষ দেখার সুযোগ মাত্র। পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতে শেষ দেখার এই সুযোগটি প্রশংসনীয় অবশ্যই। কিন্তু ক্ষমতা ও অর্থের যোগান নেই এমন কাতারের নিরীহ বন্দীদের কেউ এই সুযোগ কখনো পেয়েছেন এমন ইতিহাস নেই বললেই চলে। বর্ষীয়ান নেতা অলি আহাদ সাহেবকে হতভাগ্যই বলতে হয়। জেলে বসে বাবা, মা দুজনেরই মৃত্যু সংবাদ শুনতে হয়েছে। শুনেছি, রাজনীতির কথিত আধ্যাত্মিক পুরুষ সিরাজুল আলম খানও প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবাকে শেষ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ রাজনৈতিক কর্মী পাভেল দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। অনেক দিন জেলে ছিল। ওর বাবা ছিলেন সরকারি প্রকৌশলী। কম বয়সী সন্তানের চিন্তায় ভীষণ টেনশন করতো। আমার মনে আছে, মধুর কেন্টিনের সামনে আমাকে বলেছিল,

www.nagorikpathagar.org

"আপনারা কি আমার মৃত্যু চান, না আমার ছেলেকে এনে দিবেন।" আমি তখন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট প্রধান। পাভেলের বাবার কথাগুলো এমন করে সত্য হবে, তরুণ পাভেলকে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বাবার লাশ দেখতে যেতে হবে, এমন কখনো ভাবিনি।

পাভেলের পিতার মৃত্যুর ক'দিন পর শুরু হয় আমার প্রথম কারাজীবন। তখন জেলে বসে বাবার কথা খুব মনে হতো। হার্টের রোগী, ক'বার মরতে মরতে বেঁচে থেকেছেন। জামিনের স্লিপ ডাকলেও মনে হতো, এই বুঝি প্যারোলে মুক্তির সনদ নিয়ে বাবার লাশ দেখার ডাক পড়লো। না, তেমন দুর্ভাগ্য না হলেও আমার দ্বিতীয় কারাবরণের কদ্দিন আগে নিজের হাতে বাবাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে এসেছি। গুরুজনেরা বলতেন, পিতৃবিয়োগের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত সতর্কবস্থায় চলাফেরা করতে হয়। সংস্কারে আমি কখনো বিশ্বাস করিনা। যাই হোক, ভাগ্যের বাতাবরণে গ্রেফতার হয়ে দ্বিতীয়বার জেলে আসলাম। ফলে, বাবার মৃত্যু পরবর্তী আচার অনুষ্ঠানে থাকা হলো না। বাবা চাইতেন, আমি সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা হবো। তদ্দিনে আমি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছি। '৮৯ এর ডাকসু নির্বাচনের প্যানেল পোষ্টারে ছবি দেখে বড় ভাই রাজনীতির খবর জেনে বিরাগভাজন হবেন এই ভেবে পল্লবী এলাকায় ভাইয়ের চলাচলের রাস্তার দুপার্শ্বের সকল পোষ্টার অতি সন্তর্পনে তোলে ফেলেছিলাম। '৯০-এর ডাকসু নির্বাচনে জিয়া হল ছাত্র সংসদের ভিপি হলাম। বিএনপি ক্ষমতায় এলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সিনেটর হলাম। বাবা ও বড় ভাই বুঝলেন, সরকারি নকর হওয়া আমার কর্ম নয়। রাজনীতির এই পথ চলাকে একসময় মেনেও নিলেন। বিরোধী দলে এসে নানামুখী হয়রানি ও মামলায় জড়িয়ে গেলাম। বাবা গ্রামের সরল-সহজ মানুষ। আমাকে নিয়ে ভীষণ টেনশন করতো। মাকে বলতো, 'জেলে গেলে মানুষ বলবে কি? দেখ, ওর চিন্তা করতে করতেই একদিন মরে যাব'। হলোও তাই।

জেলে যাবার পর যখন সহকর্মীরা দলে দলে বাড়ি এসে সমবেদনা জানিয়ে গেল এবং ছাড়া পাবার পর যখন আশেপাশের গ্রামের অসংখ্য মানুষ ওদের ভাষায় 'রাজবন্দী' দেখতে বাড়ির আঙ্গিনায় ভীড় করছিল বাবা তখন বুঝতে পেরেছিলেন চোর-বাটপাড় আর রাজনৈতিক কর্মীর জেলজীবন এক

www.nagorikpathagar.org

কথা নয়। মাকে বলতে শুনেছি, বাবা প্রায়শই নামাজান্তে জায়নামাজে বসে আমার জন্য কান্নাকাটি করতেন। আজ বাবা নেই। অন্যান্য ভাই বোনদের মতো বাবার জন্যে আমার কিছুই করা হয়ে উঠেনি। তবু জেলে বসে, থেকে থেকে কেবলই মনে হয়েছে, বাবা আমার কাছের মানুষ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন।

জেলখানার সবচেয়ে সুখকর বিষয় জামিনের স্লিপ। আবার এই জামিনের স্লিপ হাতে পেয়ে কারাগারের সহবন্দীদের ছেড়ে যাবার সময় প্রায় সকলকেই কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখেছি। অচেনা অজানা মানুষগুলো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করতে করতে একসময় নিজেরা এক মায়ার সংসার গড়ে তোলে। কেউ যায়, কেউ আসে। ভাঙা গড়ার এই খেলা হরদম চলছেই।

বন্দীদের মাঝে একটা কথা প্রচলিত আছে –জেলজীবন হলো আপনজন চেনার এসিড টেস্ট। আসলেও, আইডিয়াটা মন্দ নয়। দুর্গত জেলজীবনের এই অসহায় সময়ে যারা অনুগ্রহ করে খোজ-খবর করেন, প্রকৃত অর্থেই তার হয় ভাল বন্ধু না হয় পরিবারের আপন জন। দু'একদিন কেউ খোঁজ না নিলেই নিজেকে বড় বেশি অসহায় মনে হতো।

লালবাগের খুনের আসামী পলাশ। সাত বছর জেলে আছে। আরো কতকাল থাকতে হবে কে জানে। কিন্তু এই অনিশ্চিত জেল জীবন ওর মন থেকে ভালবাসার ভাবানুভূতিকে কেড়ে নিতে পারেনি। সকাল সকাল গোসল করে, মাথায় তেল-পানি মেরে সাজ-গোছ করে রেডি। এগারটা বাজতেই রেডিও নিয়ে হাউজ পারে বসে গেল। দুপুরের খাওয়া শেষ করে যখন সকলেই বিছানায় গা লাগাই, পলাশ তখনও রেডিও নিয়ে হাউস পারে বসা। দেয়ালের ওপারে উর্দুরোডের দ্বিতল বাড়ীর জানালা খুলে মেয়েটি কখন একটু মুচকি হাসবে, সেই প্রতীক্ষায় পলাশ দিনমান ওখানটায় বসে থাকে। সকাল বেলার সাজগোছ দেখে মনে হতো বুঝি কোর্টের তারিখ আছে। জিজ্ঞেস করতেই সোজা সাপটা জবাব, "ভাই একটু টি,এস,সি যাইবার লাগছি, খবর থাকলে কন, ইনভার্সিটিতে দিয়া আমুনে।"

www.nagorikpathagar.org

বারো
জেলখানার উৎসব পার্বণ

বিশ শতক পেরিয়ে পৃথিবী যখন প্রবেশ করলো একুশ শতকের নতুন বছরে, নতুন সহস্রাব্দে, আমার তখন দ্বিতীয় কারাবাসের প্রথম পক্ষ চলছে। বিশ্বব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি করে, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে যখন নতুন শতাব্দী তথা সহস্রাব্দ বরণের আয়োজন চলছে, আমি তখন সহবন্দীদের সাথে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ছোট্ট একটি কক্ষে তালাবদ্ধ। রেডিওতে শোনা গেল, নিউজিল্যান্ডের চাথাম দ্বীপে নিয়ন বাতির চোখ ঝলসানো আলোয়, অবিরাম বাজি-পটকা ও আতশবাজি বিচ্ছুরণের মধ্য দিয়ে সহস্রাব্দ বরণের প্রথম উৎসব শুরু হয়েছে। আসলে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের সহজাত টান আজন্মকালের। মুক্ত জীবনে, এতোসব আনন্দ উচ্ছ্বাসের সাথে ভেসে যাওয়া হতো কিনা জানি না। জেলখানার লকআপে বসে কেবলই মনে হতে লাগলো, এমন একটি মাহেন্দ্রক্ষণকে উপভোগ করা গেল না, যা সকলের ভাগ্যে জুটে না। এতোসবের পরও শুধুমাত্র উদ্যাম মানসিকতার জোরে তালাবদ্ধ কক্ষে রাত জেগে বসে রইলাম বারোটা এক মিনিটের অপেক্ষায়।

সহস্রাব্দ বরণের আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাকি। মিয়াসাব এসে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিল। সাথে ছয়টি কেক (Strawbery pie) ও একটি গাদা ফুল। পাঠিয়েছেন ৬ নং ওয়ার্ড থেকে ATV মামলার আসামী আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের কেইস পার্টনার শোয়েব চৌধুরী। লিখেছেন, 'নতুন সহস্রাব্দের প্রথম সূর্যোদয় বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ, নিষ্ঠুর হায়েনাদের হাত থেকে সমগ্র জাতি মুক্তি লাভ করুক।' চার নম্বর কক্ষ থেকে চাঞ্চল্যকর হুমায়ুন জহির হত্যা মামলার আসামী কায়সার পাঠিয়েছে ছয়টি চকলেট। এরই মধ্যে উর্দু রোডের বাজি-পটকা বিস্ফোরণের সাথে সাথেই পুরো জেলখানায় শুরু হল থালা, বাটি বাজানোর বিকট আওয়াজ, আশে পাশের কক্ষের ব্যাপক চিল্লাচিল্লি ও হাঁকডাক-হ্যাপি নিউ মিলেনিয়াম। আমাদের কক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত মতো, সোহেল ভাই একটি নতুন ব্যানসন সিগারেটের প্যাকেট খুলে বারোটা এক মিনিটে দুটি সিগারেটে একযোগে অগ্নিসংযোগ করে উদ্বোধন করল নতুন মিলেনিয়াম। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আরেক বিস্ময়। ফুলের তোড়া হাতে গরাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বাগানী। দশ বছরের সাজাপ্রাপ্ত চৌদ্দ বছরের বালক রফিকুল।

আনন্দ-উচ্ছ্বাস, গান-বাজনা ও আতশবাজির বিমোহিত আলোক বিচ্ছুরণের মধ্য দিয়ে নতুন মিলিনিয়ামে প্রবেশের মুহূর্তেই বাংলাদেশে এসেছে ঈদ। খুশির দিন। নিরন্তর বহমান সময়ের স্রোতে, স্বপ্ন ভঙ্গের হিসাব-নিকাশ নিয়ে মুসলিম সমাজ যখন ব্যাকুল উদ্দীপনায় ভেসে গেল, আমি তখন কেন্দ্রীয়

www.nagorikpathagar.org

কারাগারের দশ সেলে দ্বিতীয় কারাবাসের তেইশতম দিবস অতিক্রম করছি। বন্দীদশায় ঈদ মানেই অষ্টপ্রহর স্মৃতির সাগরে ভেসে বেড়ানোর কষ্টকর কিছু বাড়তি সময় মাত্র।

জেলখানার ঈদ এক ভিন্ন রকম বৈচিত্র্যে ভরপুর। শিশির ভেজা সকালে সুবেদার মহাশয় এসে জানান দিয়ে গেলেন, মেন্টাল এরিয়ায় আমাদের জন্য ঈদের জামাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সকাল নয়টায়। প্রতিকূল সময়কে সঙ্গী করে, স্বজনের মুখচ্ছবি ভুলে থাকার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে নয়া পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে সহবন্দীদের সাথে পা চালালাম ঈদের জামাতের উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে ম্যাডাম খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে জেলবন্দী নেতা-কর্মীদের জন্য গোটা পঞ্চাশেক পাঞ্জাবী পাঠানো হয়েছে। বিএনপি'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ডাকসুর ভিপি আমান উল্লাহ আমান নেতৃস্থানীয়ের জন্য আড়ং থেকে পাঠিয়েছেন দশটি শোভন পাঞ্জাবী। মনে হলো, আমাদের সমাজে ঈদ যেমন বিত্ত-বৈভব ওয়ালাদের জন্য, তেমনি জেলখানায় ঈদ চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের জন্য। চোখের দেখা, ঈদ উপলক্ষে সপ্তাহখানেক ধরে জেলবন্দী টপটেরর ও উর্ধ্বতন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুবাদে জেলের ভিতর যে পাঞ্জাবী গ্রহণ–বিতরণের মহড়া চলল তার পরিমাণ অসংখ্য না হলেও সহস্রের কম নয় নিশ্চয়ই। এর কতাংশ নিরীহ বন্দীদের ভাগ্যে জুটেছে স্রষ্টাই তা ভাল জানেন। প্রাসাদবাসী, ভবনবাসী ও গাছতলার গরীব-কাঙ্গালকে একসারিতে একাকার করে নেয়ার স্রষ্টার ঈদ আহ্বানকে যে আমাদের সমাজ গ্রহণ করতে পারে নাই তার প্রতিচ্ছবি জেলখানাতে স্পষ্ট। ঈদের জামাতের প্রথম সারিতে চোখ পড়তেই বিস্ফারিত নয়নে অবলোকন করলাম খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষ শিখর ছোঁয়া প্রাজ্ঞ রাজনীতিক কে. এম. ওবায়দুর রহমান ও নুরুল ইসলাম মঞ্জু সাহেবকে। প্রত্যাশা ছিল, জেলাহত্যা মামলায় অভিযুক্ত শাহ মোয়াজ্জেম ও তাহের উদ্দিন ঠাকুরের দেখা মিলবে। শুনলাম, ওনারা ঈদের জামাতে আসবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। কেন, তার কারণ ওনারাই ভাল জানেন। এক সময়ের তুখোড় ছাত্রনেতা, জাতীয় রাজনীতির পিচ্ছিল পথ মাড়িয়ে, উত্থান-পতনের সিঁড়ি বেয়ে জীবন সায়াহ্নে এসে আবার জেলখানাকে কেন ঠিকানা করে নিয়েছেন, সেই গুঢ় রহস্য উন্মোচন আমার সাধ্যের বাইরে। তবে, শরৎ বাবুর সাহিত্য তত্ত্বের মারপ্যাঁচ থেকে এই কথাটা বলা অন্যায় হবে না যে, "প্রমাণ না হয়েও অনেকে জেলে যায়, সেটা জজ সাহেবের হাতে। আমরা যেটা বুঝতে পারি না, তিনি সেটা বোঝেন। আবার তুমি-আমি যেটা জলের মতো সোজা দেখি, খুব বড় জজ সাহেবের কাছে হয়তো সেটা পাহাড়-পর্বত।" নিয়তির কি নির্মম পরিহাস, যে ওবায়দুর রহমানের স্মৃতিচারণ করে শাহ মোয়াজ্জেম সাহেব তার কারাস্মৃতির 'নিত্য কারাগারে' বইটি শুরু করেছিলেন, আজ জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় জেলহত্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দু'জনই একই সেলে বন্দী দিনাতিপাত করছেন।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, নামাজের আগে পরে ওয়াজ-নছিহত চলবে না। এরই মধ্যে ইমাম সাহেবকে পাশ কাটিয়ে এক হুজুর নামাজের নিয়মকানুন বর্ণনার সুযোগে স্বল্প সময়ের মধ্যে চমৎকার করে বয়ান সেরে নিলেন। পরে জেনেছি, লোকটি বউ মার্ডার কেইসে দণ্ডপ্রাপ্ত জীবন সাজার আসামী মেজর

www.nagorikpathagar.org

হালিম। জেলখানায় এটাই একমাত্র ঈদের জামাত ছিল না। সকল বন্দী যাতে একত্রিত হওয়ার সুযোগ না পায়, সেই ভাবনাকে মাথায় রেখে ভিন্নস্থানে ও বিভিন্ন সময়ে মোট চারটি ঈদের জামাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে, পূজাপার্বণে ও বিশেষ দিনে বন্দীদের উন্নত খাবার পরিবেশনের বিধান আছে। সকাল বেলা রেডিওর খবরে তেমনই শুনেছি। আদতে পাওয়া গেল একবাটি সেমাই। যাকে সেমাই না বলে স্যাকারিনযুক্ত আটার জাউ বলা সঙ্গত হবে। রাতে একথালা পোলাউ ও গুটিকয়েক গোমাংসের টুকরা। চালটাকে পোলার চাল বলা গেলেও, ওতে বাহারি কোন ময়মশলার ছোঁয়া যে পড়ে নাই, তা পরখের জন্য চেহারা দর্শনই যথেষ্ট, মুখে দেয়ার দরকার হয় না। নামাজ সেরে দশ সেলে ফিরে এসেছি। শুরু হলো নামাজোত্তর কুশল বিনিময় পর্ব।

আমরা ডিটেনশনের আসামী। নিরাপত্তা বন্দী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি করিয়ে নিয়েছে পিন্টু ভাই-এর বউ কল্পনা ভাবী। কবিতা সেই রকমই লিখেছে। দিন কয়েক ধরেই ঈদের অপেক্ষায় আছি, পরিবার পরিজনের সাথে মিলনের প্রত্যাশায়। সময়ের ঘড়ি এগুতে চাইছে না যেন। সকাল এগারটা নাগাদ পিন্টু ভাইয়ের বাসা থেকে ছোট্ট একটি চিরকুট এলো। মুহূর্তেই একটা বিবর্ণ বিষাদের মলিন ছায়া আচ্ছন্ন করে নিল প্রত্যাশার সোনালী দিগন্তকে। বিধি বাম, আওয়ামী সরকার বাহাদুরের নির্দেশ, আমাদের দেখা সাক্ষাৎ চলবে না। কম্পমান হস্তযুগলের মাঝের ঐ ক্ষুদে পত্রখানি দিয়ে মুখ ছাপিয়ে চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল পিন্টু ভাই। পিনপতন নীরবতা। মা লিখেছে, সাত বছরের পুত্র রাতুল ঈদের দিনে বাবাকে না পাওয়ার অভিমানে নতুন কাপড় পরতে চাইছে না। অবুঝ বালকের এই ছোট্ট অভিমান একজন বাবার মনের দুয়ারে কতটা নাড়া দিয়ে গেল আমরা ক'জন সহবন্দী তার সাক্ষী হয়ে রইলাম।

মুহূর্তের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বিষণ্নতা আচমকা আমাকেও গ্রাস করে নিল। বেদনার বহমান স্রোতে প্রত্যাশার সমাধি ঘটতেই মানসপটে ভেসে উঠলো একটি ছোট্ট শিশুর মুখ। বড় আপন। আমার শিশুপুত্র জিদান। মাস তিনেক পর দুই বছরে পা রাখবে। দিনমান ঘরময় ছোটাছুটি করে, আচমকা দু'একটি কথা বলে সকলকে মাতিয়ে রাখে। আমার সন্তান, সন্তানের মা ও আমি, এই নিয়েই আমার ত্রিভুজ প্রেমের মায়ার সংসারে এবারকার ঈদটা নিরানন্দই কাটল। ভাবনায় ছেদ পড়ল। হঠাৎ ডাকাডাকি। দশ সেলের পাশেই জেলখানার বাউন্ডারি ওয়ালের গা ঘেঁষেই উর্দু রোড। ওপারে আবাসিক বাড়িঘর। কল্পনা ভাবী ও কবিতা এসেছে পার্শ্বের বাড়ির ছাদে। কথা বলার উপায়ন্তর না থাকলেও দূর থেকে আপনজনকে দেখতে পাওয়ার এইটুকু তৃপ্তিও আপদকালীন বিষণ্নতা কাটিয়ে উঠার সৌভাগ্য বলতে হবে। এ আমার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি হলেও, জেল জীবনের সেল এলাকার ঈদ-চিত্র মোটামুটি এইরকমই। তবে, জেলখানায় যে দুর্ভাগারা খাতায় থাকে ওই অভাগাদের ঈদ যে খুশির অর্থে আসে না সেটা নিশ্চিত। ওদের কাছে ঈদ মানে বাড়তি দু'টুকরা গোমাংস ও সকালের দু'চামচ বিচ্ছিরি সেমাই ছাড়া অন্য কিছু নয়। কবির মতো করে বলতে–

'জীবনে যাদের হররোজ রোযা ক্ষুধায় আসে না নিদ
তাদের আবার কিসের খুশি, কিসের বলো ঈদ'।

www.nagorikpathagar.org

তেরো
জেলখানার সেলচিত্র

জেলের ভিতরে জেল, তার নাম নব্বই সেল। কথাটি হাড়ে হাড়ে সত্য। কেন্দ্রীয় কারাগারের নাইনটি সেলকে বলা ডিটেনশন ওয়ার্ড। এখানে শুধুমাত্র ৭৪-এর বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতারকৃত ডিটেনশনের আসামীদের রাখা হয়। ডিটেন্যু মানে রাজনৈতিক কারণে নিরাপত্তা বন্দী অর্থাৎ রাজবন্দী। নব্বই সেলের আসামীদের খোঁজ-খবর নিলেই অনুমান করা যায়, কি পরিমাণ অপব্যবহার হচ্ছে এই আইনের। বিনা মামলায় আটক রাখার এ এক চমৎকার ব্যবস্থা। যতদিন সরকারের খায়েশ না মিটবে, দফায় দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে ততদিন আটকিয়ে রাখবে। জেলের ভাষায় বলেন, ভিসা এক্সটেনশন। বিশেষ আইনের মেয়াদ এক্সটেনশন সংক্রান্ত বর্তমান বিরোধী দলীয় উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বাবা বিক্রমপুরের মরহুম কফিল উদ্দিন চৌধুরীর মন্তব্য এখনো হাসির উদ্রেক করে, 'ধরে এনেছ, দু'মাস খেটে দিয়েছি। আর কেন? এটা শ্রেফ অসভ্যতা।' এই সেলে আসামীরা পনের দিন অন্তর অন্তর একবার পরিবার পরিজনের সাথে দেখা করতে পারেন, তাও স্পেশাল ব্রাঞ্চের অনুমতি সাপেক্ষ। এদের চলাচলও ভীষণভাবে নিয়নন্ত্রিত। সেল এলাকার বাইরে এক পা চলারও অনুমতি নেই। জেলখানায় ডিটেনশনকে বলা হয় ফাঁপর। ডিটেনশনের বন্দীদের সাথে কুশল বিনিময় করলে কমন উত্তর, 'ভাই, ফাঁপরে আছি'। শ্রেণীবিভেদ অনুসারে কিছু কিছু ডিটেনশনের আসামীদের অবশ্য অন্যান্য সেলেও রাখা হয়। তার ফাঁক-ফোকরে সেলের বাইরে ঘুরে আসতে পারেন। নিজের দেখার অনুমতি না থাকলেও ডিটেনশন নেই এমন সহবন্দীদের মাধ্যমে তাঁরা বাইরের সাথে সকল যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। মালামাল আনিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু নব্বই সেলে এটা একেবারেই অসম্ভব। ক্ষুধার যন্ত্রণা, অভাব-অনটন ও হাহাকারের মধ্য দিয়েই ওদের দিন কাটে। পরের উচ্ছিষ্টে বেঁচে থাকা, সে সুযোগও নেই। মাসের পর মাস বিনা বিচারে তারা কালা-কানুনের ঘানি টানছে। সাড়ে চার মাসেও রীট করা না হয়ে থাকলে তাদের হাইকোর্টে হাজির করা হয় বিনা রীটে বিচারপতিদের অনুকম্পার সুযোগ গ্রহণের জন্য। সরাসরি সওয়াল জবাবে বিচারপতি মহোদয় সন্তুষ্ট হলে মাফ। অন্যথায় আরও ছয় মাসের ফাঁপর। সরকার বাহাদুরের এই দয়ার দানকে বলা হয় বোর্ড কল।

কেইস টেবিল থেকে পশ্চিম দিকে তাকালে যে লোহার ফটক চোখে পড়ে এরই ভিতর বিশাল কম্পাউন্ডে পাশাপাশি অবস্থিত নিউ বিশসেল, দেওয়ানি, পুরানো বিশসেল, ছয়সেল ও সাতসেল। অবশ্য প্রতিটি ভবনই

www.nagorikpathagar.org

আলাদা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দেখতে সুন্দর নতুন বিশসেল। এটি একটি দোতলা ভবন। সামনে বিশাল ফুলের বাগান ও সবজি ক্ষেত। অফুরন্ত পানির ব্যবস্থা। লোকও থাকে তুলনামূলকভাবে কম। নিউ বিশসেলকে বলা হতো স্টুডেন্টস সেল। এক সময় ছাত্র রাজবন্দীদের সাধারণত এখানে রাখা হত। ডিভিশন পান না এমন প্রথম শ্রেণীর আসামীদেরকেও মাঝে মধ্যে এখানে রাখা হয়। বর্তমানে উলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে নিউ বিশ-এ রাখা হয়েছে।

নিউ বিশ সেলের দোতলায় সার্বক্ষণিক তালা বন্ধ করে রাখা হয় আসামের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী অনুপ চেটিয়া ও তার সহকর্মী লক্ষী প্রসাদ ও বাবুল শর্মাকে। অনুপ চেটিয়াকে বিদেশী ওয়ার্ডে না রেখে নিউ বিশে কেন রাখা হল এই প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে সুড়সুড় করছে বহুদিন। অবশ্য জেলজীবনে এর কোন উত্তর আমি খুঁজে পাইনি। অদ্ভুত মানুষ এই অনুপ চেটিয়া। বিদেশ বিভুঁইয়ে জেল হাজতে পড়ে আছে অথচ চেহারায় হতাশার লেশমাত্র নেই। মুখে নেই কোন দুঃশ্চিন্তা ও ক্লান্তির ছাপ। কথায় কথায় অনাবিল হাসির ছটা। থাক এই প্রসঙ্গ। কারণ সময়ই বলতে পারে বিপ্লবীদের জয় পরাজয়ের ঠিকানা।

শুনেছি ,আদালতে স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করে শাস্তি নিয়েছে; যাতে ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তরিত না হতে হয়। অনুমতি ব্যতিরেকে সীমান্ত অতিক্রম ও ভিনদেশী মুদ্রা রাখার অপরাধ স্বীকার করায় আদালত ছয় বছরের সাজা দিয়েছে। আমার নারায়ণগঞ্জের সহকর্মী জাকির খানের সাথে ভাল পরিচয় ওদের। এই সুযোগ হাত ছাড়া করা চলে না। অনুপ চেটিয়া সুঠাম দেহের আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ। শুনেছি, ইংরেজিতে এম.এ। জিজ্ঞেস করেছিলাম– কেমন চলছে ওদের দিনকাল। অত্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্তে, দ্বিধাহীনভাবে বলে উঠল–

'I think you have heard about my conviction. The situation complied me to confess my guilty before the respective court. Any way, I am hopefully waiting—one day the political situation will be changed and the doors will be opened.'

নিউ বিশের পার্শ্বে অবস্থিত দেওয়ানি, কালের সাক্ষী। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটি পুরনো লাল দালান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সামন্ত প্রভুদের মধ্যে জমি-জমা সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলার সম্মানিত আসামীদের জন্য নির্মিত হয়েছিল বাংলো টাইপের এই ভবনটি। জমিদারে জমিদারে মর্যাদার লড়াই। একদিন হলেও প্রতিপক্ষকে জেলের ভাত খাওয়ানো চাই। শোনা যায়, কোন জমিদারকেই দেওয়ানিতে দু'একদিনের বেশি থাকতে হতো না। করোটিয়ার জমিদার

www.nagorikpathagar.org

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী নাকি কোন এক সময় এই দেওয়ানিতে ছিলেন। পাকিস্তানী আমলে মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে রাখা হয়েছিল দেওয়ানিতে। আজ অবধি আর কোন আসামীকে দেওয়ানিতে রাখা হয়নি। স্বাধীনতা উত্তরকালে মুজিব সরকারের আমলে দেওয়ানিকে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। আওয়ামী লীগের পতনের কারণে তখন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বর্তমান আওয়ামী সরকারের আমলে সেই উদ্যোগের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কাজ চলছে। ভিতরে স্থাপন করা হয়েছে পিতলের তৈরি মুজিবের আবক্ষ মূর্তি। বাইরে পানির নহরের মধ্যে উঠে আসা ছয় দফার ছয়টি প্রতীকী স্থাপত্য নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মুজিবের হাতে রোপণ করা একটি সফেদা ফলের গাছ। মুজিব-স্মৃতি ধরে রাখার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে শেখ মুজিবের ব্যবহার্য আধা-ভাঙ্গা মিটশেফ, খাট, চেয়ার, টেবিল, ময়না পোষার খাঁচা, থালা-বাটি, ইজি চেয়ার, সেকেলে বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি। শোনা যাচ্ছে, পশ্চিম পার্শ্বের দেয়াল ভেঙে উর্দু রোডের সাথে এটিকে সংযুক্ত করে জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হবে।

ছাব্বিশ সেল। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের একমাত্র ডিভিশন। দূর থেকে জমিদার বাড়ির মতো দেখতে। সামনে মনোরম ফুলের বাগান। বিশাল খোলা চত্বর। প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের রাখা হয় ডিভিশনে। ডিভিশনের সৌভাগ্যবান বন্দীদেরকে বলা হয় সরকারের ঘরজামাই। ডিভিশন সেল বরাদ্দের ক্ষেত্রে জেল কর্তৃপক্ষকে মনে হলো বড়ই অসহায়। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপেই সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের শিক্ষক, শিক্ষক সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক ফেরদৌস দীর্ঘদিন আমাদের সাথে একই কক্ষে কাটিয়েছেন। ডিভিশন চেয়ে দেন দরবার করেছেন, কাজ হয়নি। শেষে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে হাইকোর্ট হয়ে যখন ডিভিশন মিলল তখন অধ্যাপক ফেরদৌসের মুক্তির সময় সমাগত প্রায়। সাংসারিক জটিলতায় স্ত্রীর দায়ের করা মামলায় জেলে আছে। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, সেই স্ত্রী-কন্যার কথা বলতে বলতে কতবার যে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। নিশ্চয়ই ফেরদৌস স্যার একদিন মুক্তি পাবেন। হয়তো পুরনো ঘর করবেন, না হয় ঘর ছেড়ে নতুন করে ঘর বাঁধবেন। কিন্তু পাঁচ বছরের শিশু কন্যা প্রণমীর কি হবে তা কেবল ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

ডিভিশনে বাড়তি সুযোগ-সুবিধার মধ্যে আছে একটি খাট, এক সেট চেয়ার-টেবিল, একটি টেবিল ফ্যান এবং ঘড়ি ব্যবহারের অনুমতি। ডিভিশন প্রিজনাররা খাবারের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকেন। সেল কম্পাউন্ডের ভিতরে আলাদা রান্নাঘর। প্রতিদিনের বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে এরা পছন্দসই খাবার গ্রহণ করতে পারেন। মেস পদ্ধতিতে পরিচালিত ডাইনিং এর নিয়ন্ত্রণও থাকে বন্দীদের হাতে। চা-চিনি ও দুধের মাসিক বরাদ্দ থাকে পর্যাপ্ত।

www.nagorikpathagar.org

খেলাধুলার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং সিজন্যাল বাডমিন্টন, ভলিবল খেলারও সুব্যবস্থা আছে। মৌলিক সুযোগ-সুবিধা যাই থাক না কেন, আরদালি-খানসামার কোন কমতি নেই। কয়েদিদের ভাবনা এমন, ডিভিশন প্রিজনারদের পদধূলি পেলেই বুঝি জীবন ধন্য হলো। এই সেলের প্রতি জেলার সাহেবের দৃষ্টির কিয়দংশ যদি অন্যত্র পড়তো তাহলে পুরো জেলখানাটাই স্বর্গবাস হয়ে উঠতে পারতো।

ডিভিশনের পার্শ্বে সাতাইশ সেলটি বড়ই বেমানান। জেলখানার সুইপার, রাস্তা থেকে ধরে আনা হিজরা ও বার্মিজ মৎস্য চোরদেরকে রাখা হয় এই সেলে। তবে সাতাইশ সেলের বিশেষত্ব হলো আয়না শাহ্র মাজার। একেবারের পূর্ব–দক্ষিণ কোণার কক্ষটিতে থাকতেন ফকির আয়না শাহ্। ঐ কক্ষেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আয়না শাহ্র মৃত্যুর পর কক্ষটিতে যত আসামী রাখা হয়েছে, কোনো না কোনো কারণে সকলেরই জেলের ভিতরে মৃত্যু হয়েছে। সেই থেকে কক্ষটিকে তালা বন্ধ করে খালি রাখা হয়েছে।

নিউ জেল কম্পাউন্ডে ঢুকতে হাতের বাঁয়ে টিনশেড হল ঘরের নাম বিদেশী ওয়ার্ড। তুলনামূলকভাবে পাকিস্তানী আসামীর সংখ্যা বেশি থাকে বলে এই ওয়ার্ডের নামই হয়েছে পাকিস্তানী ওয়ার্ড। গড়পড়তায় আসামীর সংখ্যা থাকে চল্লিশ-পঞ্চাশজন। আসামীদের মধ্যে ভারতীয় ও থাই জলদুস্যদের সংখ্যা কম নয়। কেন্দ্রীয় রন্ধনশালাকে জেলের ভাষায় বলে বড়চৌকা। বড় চৌকার পার্শ্বেই বিদেশীদের জন্য আলাদা রান্নার ব্যবস্থা আছে। পাকিস্তানী ওয়ার্ডের রান্নার মান ও কদর দুইই বেশি। বিদেশী বন্দীদের চা ও কফির যোগান দেয়া হয় নিয়মিত। সংশ্লিষ্ট দূতাবাস থেকে এদেরকে মাসিক হালকা খাবার সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যে ভবনগুলো নিয়ে এই জেলের গোড়াপত্তন হয়েছিল কালের আবর্তে তারই একটির নাম হয়েছে এরশাদ নগর। অনেকেই বলে পুরান হাজত। মেইন গেইট পার হয়ে জেল কম্পাউন্ডে ঢুকতেই হাতের বায়ে সাক্ষাৎ কাউন্টারের পার্শ্বেই এই ভবনটির অবস্থান। মুখোমুখি অবস্থিত বিশাল দুটি হল ঘর। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদকে তার ছয় বছরের একাকী জীবন কাটাতে হয়েছে এই বন্দীশালায়। সময়ের পরিক্রমায় তাই এই হাজতটির নামই হয়ে গেছে এরশাদ নগর। জেলে ঢুকেই শুনলাম, ক'দিন আগে ছাত্রনেতা নাসির উদ্দিন পিন্টুকে দশ নম্বর সেল থেকে পুরান হাজতে স্থানান্তর করা হয়েছে। কারণ, মোবাইল টেলিফোনভীতি। পুরান হাজতকে জেলের ভিতরে নির্জন দ্বীপান্তর বলা যায়। কোত্থেকে এই মোবাইল ভীতিতে পেয়ে বসল প্রশাসনকে তা কেউ বলতে পারল না। হঠাৎ একদিন কঠিন তল্লাশী।

www.nagorikpathagar.org

জেলের ভিতরে বসে নাকি মোবাইল টেলিফোনে কথা বলা হয়েছে। সেই থেকেই জেল প্রশাসনের শুরু হয়েছে মোবাইল জ্বর। ফলে ছাত্রনেতাদের ওপর চলছিল অহেতুক বাড়তি নজরদারী। তল্লাশী এলেই এগাল হেসে মিয়া সাবরা বলে উঠত– 'ভাই মোবাইল-টোবাইল আছে নাকি?' নাসির উদ্দিন পিন্টুর সাথে পুরান হাজতে ছিল মিরপুরের ছাত্রনেতা নিউটন ও কোতোয়ালির ইসহাক সরকার। সুদর্শন যুবক নিউটন কথা বলে অল্প, তবে স্বল্পতেই ভালো লাগার মতো অনেক গুণাবলী ওর আছে। কিন্তু আওয়ামী দুঃশাসন ওর পিছু ছাড়েনি। আদালতের রায়ে ছয়বার খালাস পেয়েও মুক্তি মিলেনি। প্রতিবারই জেল গেইট থেকে ধরে নিয়ে নতুন মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। কোতোয়ালীর উঠতি তরুণ ইসহাকের বিরুদ্ধে মামলা ১০৩টি। কোন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে মামলার এই রেকর্ড গ্রিনিজ বুকে স্থান করে নিলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

মেইন গেইটে ঢুকতে হাতের ডানেই অবস্থিত কারাগারে একমাত্র মহিলা ওয়ার্ড। মহিলা বন্দীদের জীবন যাত্রার সকল ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে ওয়ার্ড এলাকার ভিতরে। শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকে মহিলা জেল পুলিশ। তবে জেলার, ডেপুটি জেলার পর্যায়ের কর্মকর্তারা যে কোন সময়ই মহিলা ওয়ার্ডে যাতায়াত করতে পারেন। ওয়ার্ডের ভিতরেই আছে কারা হাসপাতালের একটি শাখা মহিলা ডাক্তার ও নার্স, দুটি ডিভিশন সেল এবং একটি ফাঁসির সেল। মহিলাদের জন্য ওয়ার্ড এলাকায় সব ব্যবস্থা আছে ঠিকই কিন্তু পুরুষের মতো জেল চত্বরে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা এদের নেই। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানদেরকে কাছে রাখতে পারেন। বয়স ছয় বছরের বেশি হলে ছেলে সন্তানকে মেন্টাল এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই জেলে থাকলে জেলের ভিতরে পনের দিন অন্তর দেখা করার সুযোগ দেয়া হয়।

মহিলা ওয়ার্ড সম্পর্কে একটা মজার কথা চালু আছে। সন্ধ্যায় লক-আপের পর সকল চাবি জেলারের কাছে জমা হয়ে যায়। কথিত আছে, মহিলা ওয়ার্ডের চাবি নাকি জেলারের বউয়ের কাছে জমা থাকে। কৌতুক হলেও মিনিংলেস নয়। তবে, মহিলা বন্দীদেরকে আদালতে আনানেওয়া করার জন্য আলাদা পরিবহন ব্যবস্থা না থাকাটা মানবেতর।

www.nagorikpathagar.org

চৌদ্দ
Punishment Cell

সমাজের নিয়ম ভাঙলে আদালতের রায়ে যেমন জেলে যেতে হয়, তেমনি বন্দীদের কেউ জেলখানার অভ্যন্তরীণ নিয়ম ভাঙলে 'কেইস টেবিল' এর রায়ে তাকে সাজা হিসাবে পানিশমেন্ট সেলে অন্তরীণ হতে হয়। অপরাধের রকমভেদের মতো পানিশমেন্ট সেলেরও প্রকারভেদ রয়েছে। Punishment Cell-এর প্রসঙ্গ আসলে প্রথমেই বলতে হয় পনের সেলের কথা। পনের সেলে যারা থাকে জেলের ভাষায় তাদেরকে বলা হয় B Class। পনের সেল একটি একতলা ভবন। ভবন ঘেঁষেই দুই হাত ব্যবধানে উঁচু বাউন্ডারি ওয়াল। পাঁচটি করে কক্ষ নিয়ে একেকটি ব্লক। প্রতিটি ব্লকের একটি কমন বারান্দা। চব্বিশ ঘন্টার বিশ ঘন্টা আসামীদের তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। শুধুমাত্র গোসল ও খাওয়ার সময় আনলক থাকে। এদের দেখা-সাক্ষাতও বন্ধ। এখানে যারা থাকে তাদের সকলেরই নাকি কম-বেশি মানসিক বৈকল্য ঘটে। কারণে-অকারণে প্রশাসনের কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা সিপাইদের অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে এবং প্রশ্রাব-পায়খানা ছুঁড়ে মারে। মিয়াসাবরা ভয়ে এদের কাছেই যেতে চান না।

তবে, ইদানীং লালবাগ কেন্দ্রিক কিছু টেররের দাপটে পনের সেলের কঠিন জীবন কিছুটা সহজ হতে শুরু করেছে। ওদেরকে দেখার অনুমতি না দিলে এমন ঝামেলা শুরু করে দেয় যে শেষে জেল নিয়ন্ত্রণই কঠিন হয়ে পড়ে। আসলে কোন শাস্তি প্রদান করেই যাদের বাগে আনা যায় না তাদেরকে মানুষ করার জন্য আর কিইবা করার থাকে। ওরা একবার গেইটে গেলে লক-আপের আগে ফিরে না। মোটকথা, যতটা সময় বাইরে থাকা যায়। সিপাইরা এদের সাথে লাগালাগি করে ব্যক্তিগত শত্রুতে পরিণত হতে চায় না। ফলে, পনের সেল এখন নামে মাত্র পানিশমেন্ট সেল, কামে নয়। বরংচ B-class গুলো ভদ্র পরিবেশের চাইতে পনের সেলে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। মাসের পর মাস ডান্ডাবেরি টানছে, কোন বিকার নেই।

পুরনো বিশ সেলকেও Punishment Cell হিসাবেই গণ্য করা হয়। একতলা ভবন। চারটি করে কক্ষ নিয়ে একটি করে ব্লক। প্রতিটি ব্লকের জন্য একটি কমন বারান্দা। এই পর্যন্তই চলাচলের সীমানা। ঘরের মেঝের একাংশ ঘেরাও দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ল্যাট্রিন। কক্ষগুলো এতই ছোট যে, বড়জোড় দু'জন করে আসামীর স্থান সংকুলান হয়। এইটুকু কক্ষে দশ-বারোজন পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

আসামী রাখা হয়। বন্দীদের পালা করে ঘুমাতে হয়। ভেনটিলেটর টিন দিয়ে মুড়িয়ে দিয়ে সূর্যালোকের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এই সেলে সাধারণত নারী নির্যাতন, চিটিং, বাটপাড়ি, জালিয়াতি ও জেল পালানো মামলার আসামীদের রাখা হয়। ঢাকা শহরের গডফাদার হিসাবে পরিচিত সন্ত্রাসী, মাস্তান ও হোমরাচোমরাদের এই সেলে রাখার রেওয়াজ আছে। ঠেলার নাম বাবাজি। বাইরে একে অন্যের জানের শত্রু, এমন অনেক সন্ত্রাসী ঠেলায় পড়ে একই সেলে একই সাথে বন্ধুর মতো দিনাতিপাতি করছে। দেখতে মজাই লাগে। অবশ্য একেবারেই হাড়াহাড়ি হয় না, এমন নয়। বন্দিত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে, পুরান বিশে এমন রেকর্ড অনেক। '৯৬-এর ঘটনা– মুজিব হত্যা মামলার আসামী খায়রুজ্জামান আছরের নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ করে পিছন থেকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে খায়রুজ্জামানকে হত্যার চেষ্টা করেছিল ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের নেতা সুমন। বিষয়টি নিয়ে পুরো জেলখানায় তখন হৈচৈ পড়ে যায়।

Punishment Cell-এর বিবেচনায় পনের ও পুরানো বিশের পরেই ছয় সেলের অবস্থান। চব্বিশ ঘন্টা লকআপ। এই সেলের আসামীদের কারও সাথে কথা বলা নিষেধ। এদের সাথে কেউ যেচে কথা বললেও Putup। গ্রিলের গেটের ওপর টিন লাগিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। এই এলাকার একেবারে বহিঃপ্রাচীর ঘেঁষে সাত সেল। সাত সেলকে বলা হয় সেমি ডিভিশন। চলাফেরার পর্যাপ্ত জায়গা থাকলেও সেলের বাইরে পা ফেলা নিষেধ। সাত সেলকে বনেদী বন্দীদের পানিশমেন্ট সেল বলা যেতে পারে।

জেল এস্কেপিং এর বহুল আলোচিত আসামী মকিম গাজীকে রাখা হয়েছে পানিশমেন্ট সেলে। মকিম গাজীর জেল পালানোর পর এবং '৯৬-এর পনের সেলের দেয়াল ভেঙে তেরোজন আসামী এস্কেপ করার পর জেল বিধানের 'রুম-চেইঞ্জ'-এর বিষয়টি অতিমাত্রায় কড়াকড়ি হয়েছে। দীর্ঘদিন একই কক্ষে থেকে যাতে করে দেয়াল ফুটো করা বা গ্রিল কাটার মতো সূক্ষ্ম কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ কেউ না পায় সেই জন্য আন্তঃভবন কক্ষ পরিবর্তন বা স্থানান্তরের এই ব্যবস্থা। কান টানলে মাথা আসে, কথায় কথা বাড়ে। জেল এস্কেপিং-এর কোন সুযোগ যদি আপনা থেকেই এসে ধরা দেয় তাহলে প্রথমেই যে কথাটি ভাববেন তা হলো – 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড় ধরা'। এস্কেপিং এর পরিণতি ও পূর্বাপর আইনের পরিষ্কার ধারণা না থাকলে এহেন অ্যাডভেঞ্চারের পথে পা না বাড়ানোই ভাল। অল্প মেয়াদের কয়েদিদের জেল পালানোর চেষ্টা নেহায়েতই বোকামি। তবে যুগ-যুগান্তরের

www.nagorikpathagar.org

সাজা নিয়ে যারা আমদানির তারামিয়ার ভাষায় জিন্দা লাশ হিসেবে জেলে আছে তারা এস্কেপিং এর সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে কি করবে না এই সিদ্ধান্তের ভার নিতান্তই তাদের। এক্ষেত্রে মকিম গাজী ও '৯৬-এর জেল পালানো কয়েদিরা এখন কেমন আছে তার একটা বর্ণচিত্র দেয়া বড়ই প্রাসঙ্গিক হবে। মকিম গাজীর সাজা ১৬০ বছর।। তিনবার জেল পালিয়েছে। তিনবারই ধরা পড়েছে। বর্তমানে পানিশমেন্ট সেলে আছে। অন্ধকার কুঠুরিতে চব্বিশ ঘন্টা লকআপ। জীবনভর পড়ে থাকতে হবে গলা থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত লোহার আওড়া বেড়ি। শিকল বন্ধনের এই যন্ত্রণা নিয়েই ওর আমৃত্যু দিনকাল। মাথায় পড়তে হবে লানতের লাল টুপি। '৯৬-র জেল পালানোদের রাখা হয়েছে পুরানো বিশ সেলে। ছোট্ট একেকটি কক্ষে আসামীর সংখ্যাধিক্য ঘটলে স্থান সংকুলানের অভাবে পালা করে ঘুমোতে হয়। পাঁচ জন বসে থাকে পাঁচজন ঘুমায়। আইনের চোখে জেল পালানোর শাস্তি ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু ছোটখাট জামিনযোগ্য মামলায়ও নাকি এদেরকে জামিন দেয়া হয় না। আত্মীয়-স্বজনের সাথে কদাচিৎ সাক্ষাৎ মিলে কঠিন নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে।

জেল এস্কেপিং ঠেকাতে এবং অভ্যন্তরীণ 'ল' এন্ড অর্ডার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার নিমিত্তে সপ্তাহে একবার কক্ষ পরিবর্তন আবশ্যক ও একদিন চলে তল্লাশী অভিযান। অবশ্য বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান যখন-তখনই পরিচালিত হতে পারে। একজন জমাদারের নেতৃত্বে সাড়ে তিন হাত লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে আট-দশজন সিপাই। এদেরকে বলা হয় 'লাঠি বাহিনী'। জেল কোডে নিষিদ্ধ এমন কোন জিনিস যাতে বন্দীরা না রাখতে পারে তার জন্য এই চিরুনি অভিযানের প্রহসন। অথচ সত্যি এই যে কাপড় চোপড়ের বাইরে যতসব জিনিসপত্র আছে প্রায় সবই নিষিদ্ধ তালিকায় পড়ে। মনে হলো, নিষিদ্ধ মালামাল না পেলে বরঞ্চ মিয়াসাবদের মেজাজ গরম হয় বেশি। শুরু হয় চেকিং এর নামে বিছানাপত্র ও ব্যাগ-বোঁচকা লণ্ডভণ্ডকরণ প্রক্রিয়া। বাথরুমের কাছে ডেকে নিয়ে নগদ বিশ টাকা ও একটা সিগারেট ধরিয়ে দিবেন - মুহুর্তেই গরম মেজাজ নরম করে একটা লম্বা সালাম ঠুকে বেরিয়ে যাবে। উটকো ঝামেলা এড়ানোর লক্ষ্যে অনেকে বিশ টাকা ধরিয়ে দেয়াকেই শ্রেয় মনে করেন। সত্যি বলতে কি, আমাকেও তাই করতে হয়েছে।

কারাগারে 'ফাইল' শব্দটির বহুবিধ ব্যবহার রীতিমত হাসির উদ্রেক করে। শাহ মোয়াজ্জেমের ভাষায়, "ফাইল, ডাইল আর গাইল-এই তিনটি হলো জেলখানার বিশেষত্ব।" প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে সকল কার্যপ্রণালীর সাথে

www.nagorikpathagar.org

এই ফাইল শব্দটি জুড়ে না দিলেই নয়। জেল সুপার পালা করে একেক এলাকা পরিদর্শনে আসেন। জেলের ভাষায় একে বলা হয় সুপার ফাইল। সুপার ফাইলের দিন সকাল থেকেই ঈদ-ঈদ ভাব শুরু হয়ে যায়। দশটার মধ্যে সব ধুয়ে-মুছে তক্তকা, ঝক্ঝক্া। কোথাও একটা গাছের পাতা পর্যন্ত পড়ে থাকতে দেখা যায় না। সুপারিনটেনডেন্ট এলাকায় পা রাখতেই ঘন্টা ধ্বনি বেজে উঠবে। সাথে সাথে সকল আসামীদের তালাবন্দী করে রাখা হবে। মহাশয় তার জেলার, ডেপুটি জেলার, সুবেদার ও অন্যান্য কর্মকর্তাসহ সদলবলে ঘুরে ঘুরে সকলের ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর নেন। তবে খাতা এলাকায় ফাইলের দিন কষ্টের অন্ত নেই। এরপর তিন বেলা গুনতি ফাইল। সকালের গুনতি, বারো গুনতি ও লকআপ গুনতি। গুনতির সময় হতেই খাতায় পাহারার চিৎকার শোনা যায়, "ফাইল, ফাইল"। সেল এলাকায় সাধারণত গুনতি ফাইলের যন্ত্রণা নেই। একেক দিন একেক এলাকায় সাধারণ মেডিকেল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। একে বলে মেডিকেল ফাইল।

মোট কথা, জেলের সকল কিছুই বন্দীদের জন্য একরকমের পানিশমেন্ট বলা চলে।

বিচারপতির রায়ের সশ্রম ও বিনাশ্রম কারাদন্ডের কোন তফাৎ কারাগারে আছে বলে মনে হলো না। জেলখানার পৃথিবীটা কর্তৃপক্ষের সুবিধামতো তৈরী করা। ওখানটায় কয়েদ খাটা আর শাস্তিভোগের কোন তারতম্য নেই। তাছাড়া পানিশমেন্ট যাদের পাওয়ার কথা, টাকার জোরে তারা খোদ পানিশমেন্ট সেলটাকেই আনন্দ-আশ্রম বানিয়ে নিয়েছে। সাধারণ বন্দীদের সাথে যে জেলার ডেপুটি জেলাররা এতোটা কর্কশ ব্যবহারে অভ্যস্ত, সেই কর্মকর্তারাই পানিশমেন্ট সেলের গডফাদারদের সাথে কথা বলতে গেলে বিনয়ের অবতার বনে যান। কথায় বলে, জেলের বাইরে থাকলে সন্ত্রাসীরা থাকে একেকজন মন্ত্রী-মিনিষ্টার আর জেলে গেলে বনে যান প্রেসিডেন্ট। ওদের জন্য ফাইল ও ডাইলের যন্ত্রণা নেই। নারী সরবরাহ ছাড়া বিলাসের বাকি সকল কিছুই ওদের জন্য রেডি থাকে। অর্থাৎ, জেলকোডের নিয়ম-কানুন ও পানিশমেন্ট সকলই নিরীহ বন্দীদের জন্য।

www.nagorikpathagar.org

পনের

ফাঁসির সেলের অজানা কথা

ফাঁসির সেল ও ফাঁসির মঞ্চকে ঘিরে মানুষের অন্তহীন কৌতূহল আজন্মকালের। কেমন দেখতে ফাঁসির কাষ্ঠটি, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে কেমন হয় নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী লোকটির শেষ প্রতিক্রিয়া। কৌতূহলী পাঠকের এতোসব প্রশ্নোত্তর সন্ধানে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, জেলের প্রতিটি চত্বরে। কথা বলেছি মৃত্যুদশা প্রত্যক্ষকারী অনেক কর্মচারীর সাথে। ফাঁসির সেলে থেকেছেন এমন সহ-বন্দীদের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনেছি দিনের পর দিন। ফাঁসির আদেশ জেল গেইট আসা মাত্রই আসামীকে স্থানান্তরিত করা হয় আট নম্বর সেলে। আট নম্বর সেলকে বলা হয় কনডেমন্ সেল। কনডেমন্ সেলের অন্ধ কুঠুরিতে বসে শুরু হয় হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট ও সর্বশেষ ধাপ রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমার প্রত্যাশায় মুক্তির প্রহর গোনা। মানুষের পক্ষে সকলই সম্ভব। বধ্যভূমিতে এক ভয়ংকর ও ভীতিকর পরিবেশে, ফাঁসির সেলের অন্ধ প্রকোষ্ঠেও একদিন মানুষ নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। প্রস্তুত হয়ে যায় নিশ্চিত মৃত্যুকে মোকাবেলার জন্য। মানুষ মরণশীল। কিন্তু দিনক্ষণ ধরে মরে যাবার এই ব্যবস্থাটি বড়ই নিদারুণ। ফাঁসির সেলের ফ্লোর একটুখানি উঁচু করে তৈরী। দু'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে রুমে ঢুকতে হয়। রুমের ভিতরে এক পাশে ঘেরাও দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ল্যাট্রিন। দরজা এতই নীচু যে, ল্যাট্রিন বসলে বাইরে থেকে মাথা দেখা যায়। আসামীকে সার্বক্ষণিক নজরে রাখার জন্য এই অদ্ভুত ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি কক্ষের জন্য একজন করে নিরাপত্তা প্রহরী। মনিটরিং-এর জন্য থাকে একজন জমাদার। চব্বিশ ঘন্টার লকআপে বসে শুধু নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা। ভাবপ্রবণ শিল্পীর অন্তহীন ভাবনায়–

দিন রাত এখানে থমকে গেছে
কনডেমন্ সেলের পাথর দেয়ালে।
প্রতি নিঃশ্বাসে মৃত্যুর দিন আমি গুনছি
শোন, জেল থেকে আমি বলছি।

ফাঁসির নির্দেশ কার্যকর করা হয় রাত্রির দ্বিপ্রহরের যে কোন সময়ে। দিনক্ষণ ঠিক হলে কর্তৃপক্ষ স্বীয় উদ্যোগে আসামীর আপনজনকে ডেকে এনে শেষ দেখার ব্যবস্থা করেন। প্রথা আছে, ফাঁসির দিন বিকেলে জেলার সাহেব এসে আসামীর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুপরোয়ানাটি পড়ে শোনান। জানতে চান মৃত্যুর পূর্বে তার কোন শেষ খায়েশ আছে কিনা। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে কিনা ইত্যাদি। সাধ্যাতীত না হলে কর্তৃপক্ষ আসামীর শেষ ইচ্ছাটি পূরণের সুযোগ করে দেন। ডঃ ইকবাল ফাঁসির মঞ্চে যাবার আগে

www.nagorikpathagar.org

তার শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগে বলেছিলেন যে, তিনি নতুন ব্লেডে দাঁড়ি কামাতে চান। চাঞ্চল্যকর শারমীন রিমা হত্যার আসামী মুনির শেষ দিন আম খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল এবং ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় একটি সিগারেট খেতে চেয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে নিষ্ঠুর ধর্ষণ মামলার আসামী হাসান ফাঁসির আগে মদ খেতে চেয়েছিল। অবশ্য তার এই আবদারটি পূরণ করা হয়নি। কর্ণেল তাহেরের ফাঁসির দিনে তৎকালীন জেলার মিঃ মিনহাজুদ্দিন যখন বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন তাঁর কিছু খেতে ইচ্ছা করছে কিনা– কর্ণেল নাকি রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, 'জেলার আপনি জীবনে যা দেখেন নাই এমন অনেক কিছুই আমার খাবার সৌভাগ্য হয়েছে। অতএব বিরক্ত করবেন না প্লিজ'। আদালতের রায়ের ফাঁসির আসামীদের দিনকাল আবেগ, কান্না, উৎকণ্ঠায় কাটলেও ক'দিনে সব কিছু মেনে নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার চেষ্টা করে। অনেকে সবকিছু ভুলে দিনরাত নামাজ কালামে ব্যস্ত থাকে। অসম্ভব ভয়ংকর ব্যক্তিও নাকি ফাঁসির সেলে নীরব-নিথর হয়ে যায়। মিয়াসাবদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এক নম্বর কক্ষটির পার্শ্বেই একটি কাঠের দরজা। এই দরজাকে বলে আখেরি দরজা। মিয়াসাবরা বলেন– এই দরজা দিয়ে কেউ ঢুকলে আর ফেরৎ আসে না। দরজাটি খুললেই সামনে চোখে পড়বে ফাঁসির চত্বর। একটু উঁচু প্ল্যাটফর্মে টিনশেডের নিচে স্থাপিত ফাঁসির মঞ্চটি। মেঝেতে নাটবলটু দিয়ে লাগানো দু'টি কাঠের খুঁটি। খুঁটি দুটির সাথে আড়াআড়িভাবে সংযুক্ত আছে একটি লোহার বার। এই বারের মাঝখানে ঝুলছে ফাঁসির দড়ি। ফাঁসির দড়িটি নিয়ে অনেক কাহিনী চালু আছে। অসম্ভব মোটা পাটের রশি। একমাথায় লাগানো আছে একটি বিদেশী পিতলের কড়া। ফাঁসির সাতদিন আগে থেকে রশিটির সেবা-যত্নের জন্য তিন-চারজন লোক নিয়োগ করা হয়। দড়িকে পিচ্ছিল করার জন্য শুরু হয় বিরতিহীনভাবে রশির গায়ে কলা, ডিম ও ঘি মর্দন, যাতে রশির ত্রুটিতে নিশ্চিত মৃত্যুর কোন ব্যাঘাত না ঘটে। ফাঁসি কাষ্ঠের নিচেই আছে মৃত্যুকূপ। মৃত্যুকূপের ওপরে বিশেষভাবে সেট করা আছে হ্যান্ডেল নিয়ন্ত্রিত দুই পাল্লার কাঠের পাটাতন। সময় হলেই জল্লাদ হ্যান্ডেল ধরে টান দিতেই পাটাতন দুটি খুলে দু দিকে ঝুলে পড়বে। ফাঁসির চূড়ান্ত মুহূর্ত উপস্থিত। যম টুপি পরায়ে, দুই হাতে হ্যান্ডকাপ লাগায়ে আখেরি দরজা দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁসি মঞ্চে। সার্চ লাইটের চোখ ঝলসানো আলো। মুহূর্তটির জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, কখন ডিআইজি সাহেবের হাতের রুমালটি ভূ-পতিত হবে। সরে যাবে মৃত্যুকূপের পাটাতন। জেলার ছাড়াও উপস্থিত থাকেন একজন বিচারপতি, সিভিল সার্জন, ডিসি, এসপি, জল্লাদ ও তার সহযোগীবৃন্দ। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে দশ-বারোজন জেল সিপাই। ফাঁসির পূর্বে একজন মুন্সী ডেকে এনে আসামীকে গোসল, অজু, নামাজ-কালাম ও তওবাসহ

www.nagorikpathagar.org

যাবতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নেয়া হয়। বিচারপতির দেয়া নির্ধারিত সময়ে ডিআইজি সাহেব তার হাতের রুমালটি ছেড়ে দিতেই জল্লাদ পাটাতনের হ্যান্ডেল ধরে দিবে টান। সাথে সাথে খসে পড়বে মৃত্যুকূপের পাটাতন। মুহূর্তেই ফাঁসির দড়িতে লটকিয়ে যাবে জ্যান্ত মানুষটি। পুরো দেহটিই ঝুলতে থাকবে কূপের ভিতর। ওপর থেকে মৃদুকম্পমান ঝুলন্ত ফাঁসির দড়িটি দেখে মনে হবে রশিটি কেঁপে কেঁপে মৃত্যু যন্ত্রণার শেষ কটি প্রহর গুনছে। তিরিশ মিনিট পর ঝুলন্ত দেহটিকে টেনে তোলা হবে। ডাক্তার সাহেবরা ঘাড় ও হাত-পায়ের রগ কেটে মৃত্যুকে নিশ্চিত করেন। শেষ রাতে লাশ হস্তান্তর করা হয় পরিবারের কাছে। লাশ নেয়ার কেউ না থাকলে কিংবা সামাজিক লজ্জায় পরিবার লাশ নিতে না চাইলে সরকারি আয়োজনে কবরস্থ করা হবে এবং এর সাথে ইতি ঘটবে একটি জীবন নাটকের। অনেক আগের কথা, ফাঁসি শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করার পর দেখা গেল লোকটি মরেনি। সেই থেকে নাকি রগ কাটার এই বর্বরতা শুরু হয়েছে। সবকিছুর পরও ফাঁসির সেলের এক নম্বর কক্ষের দেয়ালে মৃত্যুর পূর্বে আমের খোসা দিয়ে লেখা মুনিরের কথাগুলো হৃদয় ছুঁয়ে যায়, 'শারমীন, মৃত্যুর পর তোমার আত্মার কাছে আমি কি জবাব দেব।'

ফাঁসির ঘটনা নিয়ে যুগ-যুগান্তরে অনেক জানা অজানা কাহিনীর জন্ম হয়েছে। ফাঁসির আদেশ হয়েছিল, পরে হাইকোর্ট করে যাবজ্জীবন সাজা বহাল হয়েছে। ছেলেটির নাম পাখি। পাখি তখন ফাঁসির সেলে। পরিবারের সবাই দেখতে এসেছে। ভালবাসা ছিল চাচাতো বোনের সাথে। বিয়েরও পাকা কথা ছিল। শেষ দেখা। হঠাৎ ছেলেটি এক অবাক কাণ্ড করে বসল। তার ভালবাসার মানসীকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরেই এক কামড়ে গালের খানিকটা মাংসপিণ্ড ছিঁড়ে নিল। পাখিকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছি বহুবার, এড়িয়ে যেতে চায়। জেলে ওর গানের গলার খুব নাম। ভালবাসার মানুষ যাতে আমৃত্যু ওর দেয়া চিহ্ন বয়ে বেড়ায় এই জন্য হয়তো এই পশুসুলভ আচরণ।

সাধারণভাবেই একটা প্রশ্ন পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ায় যে, একজন কয়েদি কেন জল্লাদের নিষ্ঠুর কাজটি করবেন। আগেও বলেছি, কয়েদিরা জেলের ভিতর শাস্তি রেওয়াতের বিষয়টিকে পবিত্র জ্ঞান করে মেনে থাকে। একটি ফাঁসির জন্য এক মাসের শাস্তি মওকুফের বিধান রয়েছে। কাজেই যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের কাছে জল্লাদের নির্মম কাজটির চাইতে শাস্তি মওকুফের বিষয়টি অনেক বড়। মনুষত্ব ও মানবতার জায়গা বোধ হয় জেলখানা নয়। এরকম আরো অনেক অদ্ভুত বিধান আছে। যেমন– মহামান্য রাষ্ট্রপতি কখনো জেল সফরে আসলে নাকি সকল কয়েদিদের তিন মাসের শাস্তি মওকুফ করে দেয়া হয়।

www.nagorikpathagar.org

ষোল
পাগলা ঘন্টি সমাচার

জেলখানার আতংক দু'টি। পাগলা ঘন্টি ও চালান। দু'টোই নির্মম। একটা দৈহিক শাস্তি অপরটি মানুষিক। আমার জেল জীবনে এই ভয়ংকর পাগলা ঘন্টির যাঁতাকলে পড়ার দুর্ভাগ্য হয়নি। তবে, সহবন্দী পিন্টু ভাই ও নান্নুর কাছ থেকে পাগলা ঘন্টির যে বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি তা রীতিমতো ভয়ংকর। পুরো জেল চত্বরে কারারক্ষীদের বিরতিহীন বাঁশির হুইসেল, বিকট ঘন্টাধ্বনি, খটখট বুটের শব্দ, সপাং সপাং লাঠির বাড়ি এবং তটস্থ বন্দীদের উন্মত্ত দৌড়াদৌড়ি। ত্বরিৎ লকআপ। গুনতি। মারমার কাটকাট করে জেল ব্যারাক থেকে রিজার্ভ ফোর্সের আগমন। শুরু হবে মধ্যযুগীয় নারকীয় তাণ্ডব। থেমে থেমে এই অত্যাচার চলবে পক্ষকালব্যাপী।

জেল কোডে পাগলা ঘন্টি বাজানোর কি কি কারণের উল্লেখ আছে জানি না। তবে এইটুকু জেনেছি, জেল বিদ্রোহ দমনের তাৎক্ষণিক দাওয়াই হিসাবে এই ঘন্টি মাইরের ব্যবস্থা বড়ই কার্যকর। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে, বন্দীদের জীবন ধারণের মৌলিক দাবিকে অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করার জন্যই এই পাগলা ঘন্টির আয়োজন রাখা হয়েছে। জেল বিদ্রোহ, কিছু কিছু বন্দীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ, অহেতুক অভ্যন্তরীণ মারপিট, জেল এস্কেপ প্রভৃতি কারণে পাগলা ঘন্টি বাজানোর রেওয়াজ আছে। জেলখানায় অদ্ভুত আচার-আচরণের এমনকিছু বন্দী আছে যাদের আজগুবি কার্যকরণে প্রায়শই পাগলা ঘন্টি বাজানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিশাল জেলে কে কোথায় কি করল তার জন্য পুরো জেলে ঘন্টি বাজিয়ে অনর্থক এহেন ভীতির সঞ্চার নিতান্তই অর্থহীন। অনিয়ন্ত্রিত বন্দীদের বেয়াড়া আচরণ ঠিক রাখার নাম করে গণপিটুনির এই আয়োজন নাকি বৃটিশরাই রেখে গেছে। একজন মিয়াসাবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এমন কেন করা হয়। সোজাসাপ্টা উত্তর, 'মাঝে মধ্যে ওষুধ না দিলে জেল চলবে ক্যামনে?'

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের 'নিত্য কারাগার' বইতে এমন একজন বেয়াড়া কয়েদির কিছু উদ্ভট কাহিনীর উল্লেখ আছে। নাম কসিম উদ্দিন। লাইফ সাজার আসামী। পাঁচ বছরের সশ্রম দণ্ড নিয়ে জেলে ঢুকেছিল। কামপাশ ছিল বাগানে। কোন এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাগান পরিচর্যার সময় কোদালের

www.nagorikpathagar.org

এক কোপে আরেক সহবন্দী বাগানীর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই খুনের মামলায় সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন। কি কারণে এই খুন হলো সেটা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমার আলোচনা পাগলা ঘন্টি নিয়ে।

হঠাৎ একদিন পুরো জেল জুড়ে মিয়াসাবদের বাঁশির হুইসেল। বেজে উঠলো পাগলা ঘন্টি। খবর হলো কসিম উদ্দিন গলায় গামছা জড়ায়ে ফাঁস নিয়েছে। কর্তৃপক্ষের ছোটবড় সকল বাবু হাজির হলেন। গারদ খুলে কারারক্ষীরা তাড়াতাড়ি ফাঁসির রশি থেকে নামিয়ে আনলো কসিমউদ্দিনকে। সেকি! কসিমউদ্দিনের চোখে মুখে স্বাচ্ছন্দ্যের হাসি। রাগান্বিত জেলারের জেরার উত্তরে কসিম উদ্দিন বললো, 'দেখলাম, আমি আত্মহত্যা করতে চাইলে আপনারা কি করেন।' শাস্তিস্বরূপ কসিম উদ্দীনকে বন্দী করে রাখা হলো পানিশমেন্ট সেলে। তারও কিছুদিন পরে ঘটনা। সুপার ফাইলের দিন। সকাল সকাল সবকিছু ধুয়ে মুছে তকতকা ঝকঝকা। সুপার মহোদয়ের আগমনী ঘন্টা বাজতেই চারিদিকে পিনপতন নীরবতা। হঠাৎ চারিদিকে হুইসেলের শব্দ। যথারীতি পাগলা ঘন্টি। খবর এলো, কসিম উদ্দিন হেক্সো ব্লেড দিয়ে গ্রিল কেটে এস্কেপ করার চেষ্টা করছে। শত-শত রক্ষীসহ জেল সুপার হাজির হলেন কসিম উদ্দিনের সেলের সামনে। সুপারের বিস্ময়, লোহা কাটার করাত এলো কিভাবে। ভয়ংকর মূর্তিতে, চড়াগলায় জেল সুপার বললেন, এই তুই করাত পেলি কোথায়? আবারও কসিমউদ্দিনের স্বভাবসুলভ সহজ, 'আপনার মতো লোক যে জেলের সুপার সেই জেলে করাত যোগাড় করা ডাল-ভাত।'

মাহবুবুল হক নান্নু বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বি.এম. কলেজের ভি.পি। আওয়ামী নির্যাতনের জ্বালা সইতে না পেরে ঢাকা কেন্দ্রিক রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছে মাত্র। কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়। বরিশাল জেলের দুঃসহ স্মৃতি বিস্মৃত না হতেই আমার সহবন্দী হিসাবে জায়গা হয়েছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। কারাগারের অলস দিনগুলিতে ধর্মকর্ম নিয়েই ওর সময় কেটেছে বেশি। বি.এন.পি ক্ষমতায় থাকাকালে ১৯৯৫ এর পহেলা জানুয়ারি ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে এক বক্তৃতায় বলেছিল, 'ম্যাডাম আমরা আওয়ামী লীগ মুক্ত বাংলাদেশ নয়, শেখ হাসিনা মুক্ত বাংলাদেশ চাই'। সেই থেকে ওর কপাল পুড়েছে। বেচারি ঘর ছাড়া হয়ে ঢাকা এল বটে, আওয়ামী দুঃশাসন ওর

www.nagorikpathagar.org

পিছু ছাড়ল না কিছুতেই। শেখ হাসিনার ক্ষমতার প্রথম বছর। নান্নু তখন বরিশাল জেলে। একুশ বছরের ক্ষমতাহীন আওয়ামী লীগের কারান্তরীণ নেতা-কর্মীরা বিজয় দিবসকে সামনে রেখে মুজিব আমলের মতো গণমুক্তির প্রত্যাশায় ব্যাকুল। কিন্তু দিন বদলের পালায় বাকশালী আওয়ামী লীগের মতো আজকের আওয়ামী সরকার ইচ্ছে করলেই যে ক্ষমতার ততটা অপব্যবহার করতে পারে না, ওরা এটা বুঝতে পারে নাই। ডিসেম্বরের পনের তারিখ থেকেই চাপা উত্তেজনা। কর্তৃপক্ষ আঁচ করতে পেরে দিন তিনেক আগে থেকেই দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছে। রেডিও ক্লোজ না করবার কারণে যশোরের কারা বিদ্রোহের খবর মুহূর্তের মধ্যে জেলাভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এরমধ্যেই ক্রমাগত বাঁশির হুইসেল। পাগলা ঘন্টি। শোনা গেল, ফেনডিসিল মামলায় সাত বছরের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি সোহেল কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ইটের আঘাতে এক কারারক্ষীর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। শুরু হলো নারকীয় তাণ্ডব। মারপিট, অত্যাচার, নির্যাতনের এক অমানবিক, অসভ্য, আদিম অধ্যায়। কর্তৃপক্ষ যে এহেন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টির পাঁয়তারা করছিলেন সেটা বোঝা গেল তখন, যখন ঘন্টি পড়ার সাথে সাথেই সিপাইরা লাইন ধরে পুকুর ঘাটে জলের তল থেকে পাকা বাঁশের লাঠি তোলে আনতে শুরু করলো। ৯২৫ জন বন্দী। রক্ষী ২৫০। দশ জনের গ্রুপে বিভক্ত হয়ে, পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর লাঠিপেটা চলতে থাকল। মিনিট পাঁচেক পর একজনের ওপর ক্রমাগত দশ জনের লাঠির বাড়ি। রক্তের বন্যায় ভেসে গেল কারাগারের আঙ্গিনা। কারও মাথা থেঁতলে গেল, কারও হাত-পা ভেঙ্গে ঝুলতে থাকল। শরীরের মাংস অক্ষত আছে, এমন রইল না একজনও। হাজার মানুষের আহাজারি, গোঙ্গানী ও আর্তচিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। ওদের মনে এতটুকু মায়ার উদ্রেক হলো না। সন্ধ্যা নাগাদ ডি.সি সাহেব আসলেন। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এসে রক্ত ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল। পরদিনও আহতের কাউকে ওই জায়গায় পড়ে কাতরাতে দেখা গেছে। পালাক্রমে এই নির্যাতন চললো পক্ষকালব্যাপী। একমাসের জন্য দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। গোসল বন্ধ। আর খাবারের জন্য মাসব্যাপী বরাদ্দ ডাইলে-চাইলে খিচুড়ি, তিন বেলা। দুঃসহ যন্ত্রণার জেলবিদ্রোহের স্মৃতিচারণ করেছে নান্নু এই ভাবে, 'আমি বেঁচে গেছি কারা হাসপাতালে ছিলাম বলে। না হলে নিশ্চিত মারা যেতাম। কায়দা করে আশ্রয় নিয়েছিলাম বাথরুমে। মনে করতেই কষ্ট হয়, তিন দিন তিন রাত কেটেছে

www.nagorikpathagar.org

ওখানেই। ওখানেই থাকা খাওয়া, ওখানেই নামাজ কালাম। আমার জন্য শাপেবর হয়েছে এই কারণে যে মাইরের চোটে মেডিকেলে বন্দীদের অবস্থা এতটাই কাহিল ছিল যে, মেঝ থেকে উঠে এসে বাথরুম করার অবস্থা ওদের ছিল না।' একথা ঠিক, নান্নু কারাবরণ করুক এমনটা কেউই চাইনি। তবে, নান্নু থাকাতে আমার দ্বিতীয় কারাবাসের সময় কাটনো সহজ হয়েছে। জেলে আসার দিন কতক পর দেখা গেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের গুলাগুলিতে নিহত পার্থ প্রতিম আচার্যের পেন্ডিং হত্যা মামলা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে নান্নুর নামে। কথায় বলে, নামে নামে যমে টানে। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। বরিশাল থেকে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের খুনের মামলা খেয়ে বসেছে। মজার ঘটনা। সূর্যসেন হলের ক্যাফেটরিয়ার সামনে যেদিন পার্থ নিহত হয় ওইদিন ফাকা গুলিতে জসিম উদ্দিন হলের মাঠে একটি গরু মারা পড়ে। সোহেল ভাই রসিকতা করে বলতো, 'নান্নু বরিশালের ছেলে ওর নামেতো আর পার্থ মার্ডার কেইস হওয়ার কথা নয়। সম্ভবত ভুলে গরু মার্ডার কেইসটিই ওর নামে পাঠানো হয়েছে। সেই থেকে দশ সেলে নান্নুর নতুন নাম Cow Killer নান্নু। সোহেল ভাই ডাকতো CK নান্নু।

'৯৬-তে, জেল বিদ্রোহের নাম করে সেন্ট্রাল জেলে পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে যখন বন্দীদের ওপর গণপিটুনি চলছিল, তখন আমার সহবন্দী নাসির উদ্দিন পিন্টু বিশ সেলে। উনিশে ডিসেম্বর '৯৬। সকাল ১১.৩০ মিঃ আচমকা বেজে উঠল পাগলা ঘন্টি। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই আদিম বর্বরতায় মেতে উঠল জেল সিপাইরা। পনের দিন ধরে তালাবন্দী করে রাখা হলো সকল বন্দীকে। দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। চারিদিকের আতংকের ছায়া। রাত নামতেই নিঝুম নীরবতা। মাঝরাতে হঠাৎ বীভৎস চিৎকারে জেগে উঠতো পুরো জেলখানা। গভীর রাতে কেইস টেবিলের বারান্দায় পিলারের সাথে বেঁধে হ্যান্ডকাপ লাগায়ে, ভোর রাত পর্যন্ত চলতো উন্মত্ত অত্যাচার, নির্যাতন। দীর্ঘদিন পর আওয়ামী ক্ষমতারোহণের সুবাদে গণমুক্তির প্রত্যাশায় দেশের সকল জেলখানাতেই তখন চলছে চাপা উত্তেজনা। শুনেছি, ঢাকা জেলে তিন খাতায় এক হাজতি কাইর‌্যার (বালতি) আঘাতে এক মিয়াসাবকে জখমকরণের মধ্য দিয়ে এই পাগলা ঘন্টির সূত্রপাত ঘটে। কথিত আছে, এর পুরোটাই ছিল making game হাজতি, কয়েদির এই মারামারি ছিল জেল বাবুদের সাজানো

www.nagorikpathagar.org

নাটকের অংশ বিশেষ। বাইরের জেলের বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আগেই এই ঘন্টি মাইরের আয়োজন ছিল আগাম প্রতিষেধক। বিদ্রোহের নাম করে, যখন যাকে ইচ্ছে তালা খুলে কেইস টেবিলে এনে নির্যাতনের পর্ব অব্যাহত রইল প্রায় এক মাস। কখনো কোন রক্ষী ও কর্মকর্তার সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে এমন অবনতিশীল সম্পর্কের জের ধরে প্রতিহিংসা মেটানোর কারণে ঘন্টি বাজনা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠে। মোটকথা, পাগলা ঘনিট বাজানোর সময় ভেদে যৌক্তিক হলেও শেষাশেষি সকল পাগলা গন্টিই জেল সিপাইদের অপ্রয়োজনীয় উৎপাত ও প্রতিহিংসা চরিতার্থের উন্মত্ত মানসিকতার ফলে অযৌক্তিক অনাচারে পর্যবসিত হয়। এই অন্যায়ের কোন প্রতিকার নেই। নেই কোন জবাবদিহিতাও। নির্যাতনের হুমকি দিয়ে উৎকোচ আদায়ের ফন্দি চলল আরও পনের দিন। বিচারের মালিক আদালত। জেলখানা বন্দীদের সাজা খাটিয়ে নেওয়ার আবাস মাত্র। কিন্তু কোন আইনের বিধানে জেল কর্তৃপক্ষ এহেন নির্যাতনের বর্বরতা অব্যাহত রেখেছে, সেটা আমার বোধগম্য হলো না।

মোটকথা, পাগলী বাজানোর প্রয়োজনীয়তা সময়ভেদে যৌক্তিক হলেও শেষাশেষি সকল পাগলা ঘন্টিই জেল সিপাইদের অপ্রয়োজনীয় উৎপাত ও প্রতিহিংসা চরিতার্থের উন্মত্ত মানসিকতার ফলে অন্যায়-অনাচারে পর্যবসিত হয়।এই অন্যায়ের কোন প্রতিকার নেই, নেই কোন জবাবদিহিতাও। এই স্বাধীন দেশে এহেন নির্যাতনে অতিষ্ঠ বন্দীদের খেদোক্তি অনেকটা এই রকম ঃ

"ধরা যাবে না, ছুঁয়া যাবে না,
বলা যাবে না কথা,
রক্ত দিয়ে পেলাম শালার এমন স্বাধীনতা।"

www.nagorikpathagar.org

সতেরো
কালান্তরের জেল বিদ্রোহ

জেল জীবনের অধোগতি ঠেকাতে কালেকালে বন্দীদের মধ্যে বিদ্রোহ হয়েছে, হচ্ছে, হয়তো হবেও। প্রাণেরও সংহার হয়েছে অনেক বিপ্লবীর। বন্দী জীবনে বিদ্রোহ, আন্দোলন, সংগ্রামের বড় হাতিয়ার অনশন। কালা পানির দেশ আন্দামান থেকে শুরু করে আজতক সময়ান্তরে অসংখ্য বিদ্রোহের নজির আছে। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, এসব বিদ্রোহ অন্যায় পথে হয়নি। শেরপুরের বিপ্লবী রবি নিয়োগী ৩৬টি বছর কাটিয়েছে কারান্তরালে। জেল জীবনের আদিলগ্নে পাঁচ বছর কাটিয়েছেন দ্বীপান্তরে। গহীন জঙ্গলে জীবন সংহারী মশার কামড়ে কতো যে বন্দীর তিরোধান ঘটেছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে তার হিসাব নিকাশ নেই। তখন স্বদেশী আন্দোলনের দুর্দান্ত প্রতাপ। নামকরা স্বদেশী ধরা পড়লেই দ্বীপান্তরিত হতো আন্দামানে।

গেল শতাব্দীর ষাটের দশকের কথা। ১৯৫২ সাল। চল্লিশ-এর জেল কোডের বাতিলকৃত সুযোগ-সুবিধা পুনর্বহালের দাবিতে শুরু হলো অনশন। চললো এক নাগাড়ে বায়ান্ন দিন। একদিকে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকা মৃতপ্রায় মানুষগুলোর অন্তিম করুণ অবস্থা। অন্যদিকে না খেয়ে মরতে না দেয়ার কর্তৃপক্ষের দানবীয় জবরদস্তি। গরু-ছাগলের মতো চার পা বেঁধে জোর করে নাক দিয়ে তরল খাদ্য ঢোকানোর প্রচেষ্টা চললো শেষ পর্যন্ত। এমনি একদিনের কথা। জোর করে নাক দিয়ে দুধ খাওয়াতে গেলে দুধ লাঞ্চে গিয়ে শুরু হলো রক্তক্ষরণ। ইহকাল ত্যাগ করলেন বিপ্লবী সিবেন রায়। বায়ান্নের জেল অনশন শুরু হয়েছিল জুম্মার নামাজে মতবিনিময়ের সুযোগ নিয়ে। শুনেছি এরপর থেকে জুম্মার জামাত বন্ধ করে দেয়া হয়। আমার দ্বিতীয় কারাবাসের সময় দেখেছি মেন্টাল এরিয়ায় ছোটখাট একটা জামাত হয়। তবে কর্তৃপক্ষ খুব একটা ভাল চোখে দেখে না। আল মারকাজুল ইসলামের চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম ও তাঁর সহকর্মী বন্দীদের প্রভাবে হঠাৎ করে ব্যাপক বন্দী নামাজ কালামের দিকে ঝোঁকে পড়ে। শুক্রবার দিন জুম্মার জামাতে আসতে বারণ করে দেন। ঢাকা শহরকে বলা হয়ে থাকে মসজিদের নগরী। হজ্বের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সম্মেলন হয় টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমায়। অথচ সেই ঢাকার বুকে এই জেলখানাতে নামাজের কেন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই তা কর্তৃপক্ষই ভাল জানেন। মেন্টাল এরিয়ায় মসজিদ নামে যে ঘরটুকুর অস্তিত্ব আছে, তা পরিহাসমাত্র। সাত-আট বর্গগজ আধ-ভাঙ্গা শান বাঁধানো জায়গা।

www.nagorikpathagar.org

ইমামের মেম্বরের সামনে খানিকটা ভাঙা বেড়া ও জরাজীর্ণ টালির চৌচালা। কর্তৃপক্ষ একটুখানি সদয় হলে নিরাপত্তার প্রশ্ন নিশ্চিত করেও ধর্মকর্মের খানিকটা সুব্যবস্থা করতে পারেন। যদিও জেলবাবুদের এটা অলাভজনক খাত, তথাপি বন্দীদশায় দুর্ভাগ্য জীবগুলোর ধর্মকর্মের মধ্য দিয়ে সময় কাটানোর একটা ভাল উপায় হতো। নিরবচ্ছিন্ন জীবনে ফিরে আসার জন্য ধর্ম একটা ভাল পথ হতে পারতো। ধার্মিক মাত্রই সজ্জন, এমন বলছি না। তবে ধর্মবোধ যখন একটা মতবাদ এবং সমাজে তার অস্তিত্বও সার্বক্ষণিক, অবদান অদৃশ্য, তাই এই অদৃশ্যের পিছুটানে বন্দীদের সময় ক্ষেপণের একটা ভাল পথ হয়, প্রাপ্তিও হয় পরকালের।

১৯৫০–এর রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ডটি জেলবিদ্রোহের ইতিহাসের ল্যান্ডমার্ক হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। খাপড়া ওয়ার্ড ট্র্যাজেডীর নরহত্যা থেকে প্রাণে বেঁচে থাকা পিরোজপুরের বানারী পাড়ার বাম নেতা আব্দুস শহীদকে বহুবার দেখেছি বাংলা একাডেমী চত্বরে। তখন কমিউনিষ্ট নেতাদের ভীড়ে রাজশাহী জেলখানা গিজ গিজ করছে। দাবি-দাওয়া নিয়ে বেশ কদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম চলছিল। পরবর্তী কৌশল নির্ধারণের জন্য বিপ্লবীরা সকাল সকাল আলোচনায় বসলো। হঠাৎ সদলবলে উপস্থিত হলেন জেল সুপার মিঃ বিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কমরেড আব্দুল হক মিঃ বিলের সাথে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন, ওখান থেকেই আক্রমণের সূত্রপাত। এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে, পিছন থেকে কেউ একজন মিঃ বিলকে গালি দেয়ার কারণেই ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। বাহানা যাই হোক না কেন, একটা কথা ভারী পরিষ্কার যে, বিল প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলেন। আক্রমণের কার্যকারণ তিনি তৈরি করেই নিতেন। আগুনঝরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ উদভ্রান্ত বিল গুলির নির্দেশ দিলেন, সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল জেল ইতিহাসের জগন্য ট্র্যাজেডী খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকান্ডের সাঁড়াশি আক্রমণ। দরজা বন্ধ থাকায় জানালার ফাঁক দিয়ে শুরু হলো অবিরাম গুলিবর্ষণ। থেমে গেল প্রাণের স্পন্দন। জমপুরীর নীরবতা গ্রাস করে নিল সব কিছুকে। খাপড়া ওয়ার্ডের ফ্লোর বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো তাজা রক্তের স্রোত। এরপর দরজা খুলে নিহত আহতদের ওপর চললো দফায় দফায় লাঠিপেটা ও হান্টারের আক্রমণ। ঘটনাস্থলে প্রাণ হারালেন রাজশাহীর বিজনসেন, কুষ্টিয়ার হানিফ শেখ ও দেলোয়ার, খুলনার আনোয়ার, ময়মনসিংহের সুখেন ভট্টাচার্য, রংপুরের সুধীন ধর এবং দিনাজপুরের কম্পমান সিং। গুরুতর আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করে প্রাণে বেঁচে

www.nagorikpathagar.org

রইলেন, বর্ধমানের কমরেড মনময়, যশোরের আব্দুল হক। বগুড়ার শ্যামা প্রসাদ সেন, পাবনার আমিনুল ইসলাম বাদশা, পবিত্র প্রসাদ রায়, নন্দ স্যানাল, বরিশালের সদানন্দ ঘোষ, সিলেটের প্রিয়ব্রত দাশ ও অনন্ত দেবসহ অনেকে। এদের মধ্যে অনেকেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

আমিনুল ইসলাম বাদশার স্মৃতিতে খাপড়া ওয়ার্ড ট্র্যাজেডীর বীভৎসতা এই রকম ঃ "আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তারপরও আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করলাম। থালা, বাটি, শিশি, ঘটি, দোয়াত, বদনা যা হাতের কাছে পেলাম তা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। আমাদের পিটিয়ে চ্যাপ্টা করে দেয়া হলো। এ যেন এক নরক। কোন এক দানব এসে সব চুরমার করে ভেঙ্গে দিয়ে গেল।" প্রয়াত আব্দুস শহীদ ঘটনাটিকে চিত্রায়িত করেছেন এইভাবে, "কেউ যদি কোন কাল্পনিক নরকের ভয়াবহ চিত্র কোনদিন কল্পনা করে থাকে তার কল্পনার সাথে এই বাস্তব চিত্র সাদৃশ্য থাকবে নিশ্চয়ই"।

এযাবৎকাল জেল ইতিহাসের বিদ্রোহ-উপাখ্যানের সবচেয়ে ভয়ংকর ও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে আশির দশকে খুলনা কারাগারে। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাস। বিদ্রোহের সময় খুলনা জেলে কর্মরত ছিল, নম্বর প্রকাশে অনিচ্ছুক দেলোয়ার নামের এমন একজন কারারক্ষীর কাছ থেকে এই বীভৎস কাহিনীটি শোনা। খুলনা জেল ট্র্যাজেডীতে কর্তৃপক্ষের নরহত্যার চেয়ে বন্দীদের নারকীয় তাণ্ডবের প্রতি নাকি সমর্থনের চেয়ে ধিক্কারই হয়েছে বেশি। প্রায় চব্বিশজন কারারক্ষী ও একজন ডেপুটি জেলারকে জিম্মি করে বন্দীদের এই বিদ্রোহ চলে তেইশ দিন। বন্দীরা জেলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে কারাগার থেকে বঙ্গভবন অব্দি আলোড়ন তোলে দেয়। সুবিধা আদায়ের নামে জিম্মিদের আটক অবস্থার সুযোগে ভাল উদ্যোগের পাশাপাশি যোগ হয় মন্দমাত্রা। যেমন, পনের দিন অন্তর একদিন স্ত্রী-সহবাসের সুযোগ দিতে হবে ইত্যাদি। ১২০০ বন্দীর মধ্যে বিশ জন ছিল মহিলা। বিশৃংখল অবস্থার সুযোগে বিভ্রান্ত কিছু বন্দী করে বসলো জঘন্যতম ঘটনা। মহিলা ওয়ার্ড থেকে বন্দীদের ধরে এনে শুরু হলো ধর্ষণ। শোনা যায়, এই পালাক্রমিক ধর্ষণে চারজন মহিলা কয়েদি মৃত্যুবরণ করে। কোনভাবেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছিল না। স্থানীয় সিভিল প্রশাসন ব্যর্থ। মন্ত্রীর পর মন্ত্রী এলো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলেন। শেষে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি এলেন। তারপরও কাজ হলো না। অবশেষে সরকার পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে গুলি চালালো। এই বিদ্রোহে প্রায় ৪০০ বন্দীর মৃত্যু ঘটে। পঙ্গুত্ব-বরণ করে বেঁচে আছেন অনেকেই। কারারক্ষী দেলোয়ারের মতে, এই চরম বিদ্রোহের পরই জেলখানাগুলো নিষিদ্ধ পল্লী থেকে সমাজের সরল রেখায়

www.nagorikpathagar.org

আসতে শুরু করে। '৯০-এর আন্দোলনের পর তো ঢাকা কারাগারে বন্দীরা বিকল্প প্রশাসনই গড়ে তুলেছিল।

অবিভক্ত পাকিস্তানে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারা ইতিহাসের অনেকটুকু জুড়েই শেখ মুজিবের অবস্থান। বন্দীদের মধ্যে আজতক শেখ মুজিবকে নিয়ে কত যে কল্পকাহিনী চালু আছে তার শেষ নেই। শেখ মুজিবের সহবন্দীদের স্মৃতিচারণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভারত বিভক্তি থেকে হাল নাগাদ পর্যন্ত শেখ মুজিবই ছিল ঢাকা জেলে সবচেয়ে ক্ষমতাধর বন্দী। বন্দী ও প্রশাসন দু'য়ের উপরই ছিল শেখ মুজিবের ব্যাপক প্রভাব। বিদ্রোহ, আন্দোলন ও জীবন বিসর্জন দিয়ে অন্যরা যা আদায় করতে পারতো, শেখ মুজিব শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ও অনুরোধ করেই তার চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা নিতে পারতেন। আমার কাছে জেল ইতিহাসে শেখ মুজিবের এই অবস্থানটা বড় বেশি ironical মনে হয়েছে। আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা পরিণত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিব নিজে জেল খেটেছেন, জেলের দুর্গতিকে মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছেন, দুর্ভাগা বন্দীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিপ্লব করেছেন, সফলও হয়েছেন। অথচ নিয়তির কি নির্মম পরিহাস, নিজে ক্ষমতার মসনদে বসে, জেল জীবনের সোনালী অতীতকে বেমালুম ভুলে গিয়ে পরিণত হলেন স্বৈরশাসকে। মুজিব আমলে আমাদের কারাগারগুলো যেমন চলেছে তার একটি সুনিপুণ খতিয়ান পাওয়া যেতে পারে স্ট্যালিন সরকার সম্পাদিত রাজনীতিকদের কারা জীবন থেকে। মুজিবীয় আদর্শের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন অথচ শ্রীঘর মাড়ান নাই এমন ঘটনা বিরল। বর্ষীয়ান নেতা অলি আহাদ বলেছেন, '৪৮ থেকে ১৬ দফা কারাগারে গিয়েছি। কিন্তু '৭৪-৭৫ সালের মতো দুঃসহ দৈহিক ও মানসিক কষ্ট আর কখনো পাইনি। ক্ষমতা মানুষকে কতটা অমানুষ করতে পারে শেখ মুজিব তার জ্বলন্ত প্রমাণ।' কথিত আছে, শেখ মুজিবকে জেলে আসতে কখনো পকেট গেইটে মাথা নুয়ায়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হতো না। প্রধান ফটক উন্মুক্ত করে কর্তৃপক্ষ সসম্মানে শেখ মুজিবকে গ্রহণ করতেন।

১৯৭৩ সাল। মাওলানা ভাসানী, আয়েন উদ্দিন, আব্বাস আলী খান, মাওলানা মান্নান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, খানে সবুর, তসলিম উদ্দিন, শাহ আজিজ ও মোঃ ইফসুফসহ অনেকেই তখন মুজিব সরকারের কারাগারে আটক। হঠাৎ একবার এদের দৈনিক পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। খবরের

www.nagorikpathagar.org

কাগজের বরাদ্দ পুনর্বহালের দাবিতে শেখ মুজিবকে লেখা খানে-এ-সবুরের চিঠিটি ছিল এই রকম– 'আমরা কতিপয় ভাগ্যবিড়ম্বিত লোক ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়িতেছি। দেশ ও বহির্বিশ্বের খবর জানার মাধ্যম ছিল একমাত্র পত্রিকা। সেটাও তুমি বন্ধ করে দিলে। পুনরায় আমাদের জন্য পত্রিকা সরবরাহ করলে খুশি হব'। শুনেছি, চিঠি পাওয়ার পরদিন থেকেই শেখ মুজিব পত্রিকা পুনর্বহালের নির্দেশ দেন। তবে, একটা কথ্য সত্য যে, মুজিব আমলে জেলখানা হয়ে উঠে মুজিব আদর্শের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মিলন মেলা। ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন, অলি আহাদ, টিপু বিশ্বাস, বিমল বিশ্বাস, শফিউল আলম প্রধান, আসম আবদুর রব, মেজর জলিল, নূরে আলম জিকুসহ অনেক প্রগতিমনা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও একসময়কার আওয়ামী নেতাদেরও মুজিব আমলে কারাগারে দিন কাটাতে হয়েছে।

ইতিহাসের এতোসব অমোঘ পটপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বন্দীদের জীবনমানের অধোগতি নিয়ে তাই কালে কালে যে বিদ্রোহ, আন্দোলন, সংগ্রাম হয়েছে তার কোনটাই বিফলে যায় নাই, পুরোপুরি সফল হয়েছে এমনও বলা যাবে না। জেল বিদ্রোহের বিপ্লব, আন্দোলন, সংগ্রামের ওপর রাজনীতিক অলি আহাদের মন্তব্য স্মরণ করা প্রাসঙ্গিক হবে, 'কারাগার হচ্ছে সব দেশের সব জালিম সরকারের সুপ্রতিষ্ঠিত দুর্গ। দুর্গান্তরালে নিরস্ত্র বন্দীদের পক্ষে কোন প্রকার বিদ্রোহাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আত্মঘাতী। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কারান্তরালে ন্যূনতম সংগ্রামও সম্ভব নয়।' কারা অধিকর্তাদের দায়বদ্ধতাহীন অসীম ক্ষমতা প্রসঙ্গে জাগপার আনিসুর রহমান বলেন, 'কারাগারের বন্দীরা ভিন্ন প্রজাতির ভয়ংকর জীব; এদের বাগে রাখতে হলে কারাগারে একটা বিভীষিকার ভাব বহাল থাকা চাই- এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কারাপ্রশাসন পরিচালিত।'

www.nagorikpathagar.org

আঠারো

নেশার জগৎ ও কারা হাসপাতাল

জেলখানা এক আজব জায়গা। অনিয়মই এখানে নিয়মের বিধানে পরিণত হয়েছে। লম্বা কারাবাসের একঘেয়ে জীবন অনেক সময় বন্দীদের পথভ্রষ্ট করে ফেলে। জালেম হয়তো কামেল হয়ে যায়, আবার ভাল মানুষ নীতিভ্রষ্ট হয়ে নেশায় ধুঁকে। দুর্ভাগ্য, জেলের একমাত্র নিরাময় কেন্দ্র কারা হাসপাতালে নীতিভ্রষ্ট মানুষের মন ও শরীর কোনটারই চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। জানি, এতোসব অসঙ্গতির বিবরণ হয়তো অনেককেই অসুখী করবে। তাই বলে যদি ভাবেন, এটা নিছক কোন রাজনৈকি কর্মীর পক্ষপাতদুষ্ট লেখা, তাহলে বলব যারা তলোয়ার চালাতে জানে তাদের দু'একজন তুলিও চালাতে জানেন।

জেল-জগৎ হলো অবাধ নেশার অবাক পৃথিবী। এখানে গাঞ্জা-ভাং থেকে শুরু করে ফেনসিডিল ও হিরোইনের অফুরন্ত সরবরাহ। এসবি, ডিবি ও নারকোটিক্স ডিপার্টমেন্টের কোন বালাই নেই। ঝামেলাবিহীন রমরমা বাজার। নেশার বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য জেলখানার সুইপারদের। সুইপারদের প্রধানকে বলে ওস্তাগার। ওস্তাগার ছিলেন এমন একজন কয়েদির সাথে কথা হলো। প্রতিদিন গড়ে জেলখানায় লাখ টাকার মাদকদ্রব্য বেচাকেনা হয়। লভ্যাংশের মোটা অংক দিতে হয় কর্তৃপক্ষকে। বাইরের তুলনায় ভিতরের বাজার চড়া। সিগারেটের প্যাকেটের ভিতরের রাংতা করা কাগজে মোড়ানো একপাতা হিরোইনের দাম একশ টাকা। চার ইঞ্চি লম্বা কাগজে রোল করা গাঞ্জার স্টিককে বলে একেকটি বালিশ। এক বালিশ গাঞ্জার দাম আশি টাকা। জেলের ভাষায় গাঞ্জাকে বলে শাকসবজি, ফেনসিডিলকে বলে - বাঘের দুধ। এক পাতা ইনোকটিন ট্যাবলেটের মূল্য একশ টাকা। ওয়ার্ডে কামপাসওয়ালা যে কোন কয়েদির মাধ্যমে খবর দিবেন। দশ মিনিটের মধ্যে আপনার নেশার সামগ্রী হাজির। ধূমপানের অভ্যাস ছিল না এমন অনেক ছেলেকে দেখেছি জেলে এসে হিরোইনখোর-এ পরিণত হয়েছে। যুবক ও তারুণ্যের জন্য জেলখানা বড়ই পিচ্ছিল পথ। গরীবকে খাটিয়ে মারা ও ধনীকে নেশায় মারার সকল পাকাপোক্ত ব্যবস্থা এখানে করা আছে। এক পাতা হিরোইনের পয়সা পাবে, এই আশায় অনেক ভদ্রঘরের সন্তানকে অপরের হাত-পা টিপতে দেখেছি। পরের কাপড় চোপড় ধুইয়ে দেয়া থেকে শুরু করে পায়খানার বদনা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। যারা ভাবেন, জেলখানা

www.nagorikpathagar.org

সংশোধনাগার ও আত্মশুদ্ধির জায়গা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলি আত্মশুদ্ধি নয়, আজকের জেলখানা আত্মধ্বংসের সনাতনী কারখানা। ভাসমান মানুষকে অতলে তলিয়ে দেবার সকল আয়োজন এখানে সম্পন্ন আছে। জেলের ভিতরে নেশার সামগ্রী আসে সাধারণত খাবারের ভিতরে করে। তবে প্রধান বাহন 'কারেন্ট'। না, ডেসার লোডশেডিং-এর বিদ্যুৎ নয়। নেশাখোরদের অসভ্য পরিবহন ব্যবস্থা। পলিথিনে মুড়ায়ে পায়খানার রাস্তায় ভরে মাল আনা নেওয়ার এই ব্যবস্থাকে জেলের ভাষায় বলে 'কারেন্ট'। মাল হাতে পৌঁছানো মাত্র এক মুহূর্তে কিভাবে হাওয়া গেল গেল টেরই পাবেন না। সময় মতো এক গ্লাস পানি ও বাথরুমে এক মিনিট সময় হলেই হলো। মাল চলে আসবে। কষ্ট লেগেছে, স্কুল সেকশনের বারো বছরের ইদ্রিসকে হিরোইন খেতে দেখে। শিশু ওয়ার্ডে ছয়/সাত বছরের বাচ্চাদের গাঞ্জা টানার দৃশ্য নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। হায় সেলুকাস! কি বিচিত্র এই জগৎ।

চলুন দেখে আসি কারা হাসপাতালের কি হালচাল। সেও এক ভয়াবহ চিত্র। জেলখানা সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে কিন্তু মেরে ফেলে না। কারা হাসপাতাল অসুস্থ মানুষটির মৃত্যু নিশ্চিত করে। এটাকে হসপিটাল না বলে হোস্টেল বলাই শ্রেয়। বড় লোকের নার্সিং হোম। টাকাওয়লাদের আনন্দ-আশ্রম। আপনি যদি জেলের ভিতর বিজলি পাখার বাতাস চান, তক্তপোশে শুয়ে শতছিন্ন মশারীর আবরণ চান, তাহলে কারা হাসপাতালে ভর্তি ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত টাকার সংস্থান হলে, রোগবালাই এর কোন প্রয়োজন হবে না। দুইশ সীটের হাসপাতাল। গাদাগাদি করে ভরা। তবে এদের মধ্যে সত্যিকার রোগীর সংখ্যা তিরিশের বেশি হবে কিনা সন্দেহ। সত্যিকার অর্থে যারা রোগে শোকে ভুগছে তাদের যত্ন-আত্তির কোন ব্যবস্থাই লক্ষ্য করা গেল না। কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বন্দীসহ দশ হাজার লোকের নিয়মিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় কোন প্যাথলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট-এর ব্যবস্থা ও এক্সরে মেশিন নেই। সর্বরোগের একই চিকিৎসা-এন্টিবায়োটিক, প্যারাসিটামল ও হিস্‌টাসিন। অবশ্য উপযুক্ত টাকা দিলে প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ আপনি এখানেই পাবেন। সিরিয়াস রোগীদের টাকা ছাড়া প্রেসক্রিপশন হবে, ঔষধ হবে না। হাসপাতাল নামের এই নার্সিং হোমে থাকতে হলে মাসে আট হাজার টাকা গুনতে হবে। প্রথম কিস্তি থেকে সুবেদার পান পাঁচশ টাকা। বাকি

www.nagorikpathagar.org

টাকা ডাক্তার বাবুর। উপরস্থ বড় কর্মকর্তার সফরের দিন আগে থেকেই পেইড বোর্ডারদেরকে অন্যত্র সরিয়ে রাখা হয়। বড় বাবুরা জানেন না এমন নয়, তবে চোখের সামনে যাতে না পড়ে এই জন্য এই ওপেন-সিক্রেট লুকোচুরি। বাইরের হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর অনুমতিকে জেলের ভাষায় বলে মিনিট করা। আপনি যদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং আপনি দু'একদিনের মধ্যে মরছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার সাহেবরা আপনাকে ছাড়ছেন না। যদি যথাসময়ে সুচিকিৎসা করিয়ে বাঁচার খায়েশ থাকে তাহলে পাঁচ-দশ হাজার টাকা ঢালুন। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখবেন আপনি পি.জি হাসপাতালে পৌছে গেছেন। হাসপাতালে ভর্তি না হয়েও অবজারভেশন থেকে আপনি হাসপাতালের উন্নত খাবার পেতে পারেন। ডাক্তার বাবুর আরদালিকে একশ টাকা ধরিয়ে দিবেন, পনের দিনের জন্য মেডিকেল ডাইটের বরাদ্দ পেয়ে যাবেন। বাড়তি আয়ের যোগান দিতে, প্রতি ডাক্তারকে দিনে পনেরটি ডাইট পাশের ভাগ রাখা হয়েছে।

রোগী মরলো কি মরলো না, রোগ বাড়লো কি কমলো না, এ নিয়ে কারা ডাক্তার বাবুদের কোন বিকার নেই। ঠাট দেখলে মনে হয়, ওরা বন্দীদের রোগী ঠাওরানোতো দূরের কথা মানুষই মনে করে না। মিয়াসাবরা বলেন ভালো, জেলখানায় পোষ্টিং হলে নাকি ডাক্তাররা নিজেদেরকে একেক জন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভাবতে শুরু করেন। কারণ, বন্দীদের যে কোন কিছুতেই প্রতিবাদ করতে নেই। তবে ডাক্তার বাবুদের কিছু কিছু অবহেলা ক্ষমার অযোগ্য। ডেমরার বি.এন.পি নেতা জাকির হোসেন। দিন কতক হলো দশ সেলে ঘটা করে পঞ্চাশতম জন্মদিন পালন করলো। সতেজ মন ও সুঠাম দেহ। চোখে দেখে এতটা বয়স অনুমান করা কঠিন। হঠাৎ একরাতে পাশের কক্ষে থেকে ডাকাডাকি, কান্নাকাটি। এশার নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় জাকির ভাই-এর স্ট্রোক হয়েছে। সারারাত তালাবদ্ধ কক্ষে লোকটি অবচেতন হয়ে পড়ে রইলো। নিয়মের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে পাঠানো গেল না। কি নির্মম ও বীভৎস! বারো ঘন্টা পর, পরদিন সকল ডাক্তার এলেন, জাকির ভাইকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠনো হলো। শুনেছি, সময় মতো চিকিৎসা না পাবার কারণে দেহের এক সাইড প্যারালাইজড হয়ে গেছে।

হাসপাতালের অধীনে আছে পাগল সেল। এটকে পাগলের চিকিৎসা কেন্দ্র না বলে চিকিৎসকদের পাগলামি কেন্দ্র বলাই শ্রেয় হবে। যদ্দুর মনে পড়ে, ছেলেটির নাম রফিক। মামাতো বোনের সাথে গড়ে উঠা দীর্ঘদিনের

www.nagorikpathagar.org

প্রেম এক সময় দৈহিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়। সবকিছু জানাজানি হওয়ার পর মেয়ের বাবা-মা মেয়েকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে ওর নামে নারী নির্যাতনের বিশেষ বিধানে মামলা ঠুকে দেয়। প্রথম দুদিন ভালই ছিল। তিন দিনের মাথায় ওর মধ্যে একটা মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে শুরু করলো। পাগলের সার্টিফিকেট দিয়ে ওকে মেন্টালে আটকে রাখা হল। কদিনেই রফিকের পাগলামির মাত্রা বেড়ে গেল। ফলে প্রথা অনুযায়ী শুরু হয়ে গেল কারা হাসপাতালের আদিম জলচিকিৎসা। চৌবাচ্চার পানিতে নাক-মুখ ডুবিয়ে শরীর নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত জোর করে ধরে রাখা। লম্বাচৌড়া, সুঠাম দেহের অধিকারী রফিকের শরীরে ছিল অসুরের শক্তি। প্রতিদিন সকালে এক ঘন্টাব্যাপী চললো জলচিকিৎসা। ওকে চৌবাচ্চায় চুবানোর জন্য দশ-বারোজন লোকের দরকার হতো। অবশেষে সাতদিন পর চোখের সামনে রফিকের দানবীয় শক্তি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে গেল। অবাক কাণ্ড! এমনতর অমানবিক, নির্মম ও নিষ্ঠুর চিকিৎসায় কাজ দিল। রফিক অচিরেই তার সকল দুঃসহ স্মৃতি ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলো বটে, কিন্তু প্রাণচঞ্চলতা ও জওয়ানি রোশনাই চিরতরে হারিয়ে গেল।

অবুঝ পাগলের কার্ডে ডাইট পাস করায়ে অন্যত্র বিক্রি করার মতো অমানবিক বিষয়ও এখানে অহরহ ঘটছে। ডাক্তারের সাথে কোন বন্দীর বিরোধ ঘটলে মানসিক বৈকল্যের রিপোর্ট পেশ করে পাগল সেলে আটকিয়ে রেখেছেন এমনও ঘটনা আছে। কারা হাসপাতালটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিধায় জেল কর্তৃপক্ষের সাথে ডাক্তারদের সম্পর্কের টানাপোড়েন চলে বারোমাস। জেলখানার সাত-আট হাজার বন্দীর মধ্যে পাঁচ হাজারেরও বেশি লোক সকল সময়ই চর্মরোগে আক্রান্ত থাকে। ফলে কারা হাসপাতালের প্রধান কাজই হচ্ছে খুঁজলির চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকে। খোস-পাঁচড়ার আক্রমণে শরীর খসে পড়ার অবস্থা হয়েছে, এমন রোগীদের রাখা হয় তিন খাতার আট নম্বর ওয়ার্ডে। জেলের ভাষায় বলে, গেন্টু ওয়ার্ড। গেন্টু ওয়ার্ডের চিকিৎসা ব্যবস্থা যে কোন আদিমতাকে হার মানায়। সকাল বেলা উলঙ্গ করে মেডিসিন মিশ্রিত পানির সাহায্যে সারা শরীর ছালা দিয়ে ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা হয়। কি অদ্ভুত চিকিৎসা ব্যবস্থা।

www.nagorikpathagar.org

উনিশ
শিশু অপরাধীদের হালচাল

জেলখানায় শিশু জগতের চিত্র ভয়াবহ। চারটি একতলা ভবন ও একটি কিশোর পানিশমেন্ট সেল নিয়ে মেন্টাল এরিয়া। শিশু-কিশোরদের থাকার জায়গার নাম মেন্টাল কেন হলো বলতে পারিনে। তবে একটা কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে অস্বাস্থ্যকর, নোংরা ও দুর্গন্ধময় পরিবেশের মধ্যে গাদাগাদি করে শিশুরা বসবাস করছে, তাতে ওদের মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠার কোনই সম্ভাবনা নেই। হতাশার বিষয়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শিশু বন্দীদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। কিন্তু বাড়ছে না ওদের থাকা-খাওয়ার সুযোগ-সুবিধা। জায়গার সংকুলান হয় না বলে, একজনের মাথা আরেকজনের পা, অর্থাৎ উল্টা-সিধা ৬৯ পদ্ধতিতে ওদের শোয়ার ব্যবস্থা। শখ করে ঢুকেছিলাম মেন্টাল ৫-এ। উটকো, গোমট ও ভ্যাপসা একটা বাজে রকমের তীব্র দুর্গন্ধ ধক করে নাকে ঢুকতেই বমি। আসলে, জেলখানায় শিশু-কিশোরদের দুর্বিষহ দুর্ভোগ ও দুঃসহ দুগর্তির কথা চোখে না দেখলে লিখে বোঝানো মুশকিল। দশ বছরের কম বয়সী শিশুদের রাখা হয় মেন্টাল ৫-এ। দাঁড়ি চুল পাকা একজন বৃদ্ধ কয়েদিকে রাখা হয় ওদের সার্বক্ষণিক দেখাশুনার জন্য। যে বয়সে হেসে-খেলে মায়ের কুলে ঘুমপাড়ানি গল্প শুনে সময় কাটানোর কথা সেই সময়ে পাঁচ বছর বয়সী জুলহাসের দিন কটে জেলখানার মেন্টাল ৫-এ। আশ্চর্য হলেও ঘটনাটি নিজের চোখে দেখা। অবিশ্বাস করি কি করে।

ছেলেটির নাম রাসেল। বয়স ছয় বছরে পড়লেও দেখতে শুনতে, আকার আয়তনে এখনো কুলের শিশুর মতো। এক বছর হল জেলে আছে। বাড়ি টেকেরহাট, বাবার নাম কাওসার এইটুকু ছাড়া ওর আর কিছু মনে নেই। জেলে কি করে আসলো জিজ্ঞেস করলে চটপট উত্তর দেয় হারাইয়া গেছিলাম। বয়সে বড় ওর সহবন্দীরা বললো, প্রথম প্রথম মায়ের কথা মনে করে প্রায়শই কান্নাকাটি করতো। গত এক বছরে ওর মন থেকে আপনজনের স্মৃতি মুছে গেছে। এখন জেলই ওর বাড়িঘর। দিনমান মেন্টাল এরিয়া, দশ সেল, সাতাইশ সেল এলাকায় দৌড়াদৌড়ি করে, ছোটাছুটি করে ওর দিন কাটে। জীবনের মানে বুঝে ওঠার আগেই ওর জীবনের ঠিকানা হারিয়ে গেছে। এই অনাথ বালককে বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কোন সরকারি উদ্যোগের ব্যবস্থা নেই। কোন একদিন মানবাধিকার সংস্থা হয় তো ওর কাছে একটি মুক্তির সনদ ধরিয়ে দিবে। হয়তো কিশোর রাসেল জেলখানার বাইরে পা রেখে এই অবাক পৃথিবীর চোরাগলিতে জীবনের সন্ধান না পেয়ে বলে উঠবে- জেলেইতো ভাল ছিলাম।

www.pathagar.com

সাত বছরের বালক মুকুল থাকে স্কুল ৫-এ। এক বছর আগে ফকিরাপুল থেকে বোমাসহ গ্রেফতার হয়েছে। পরিবার-পরিজন, বিচার-আদালত কোন কিছুর সাথেই ওর যোগাযোগ নেই। বোঝেও না। বোঝার বয়সও হয়নি। ফকিরাপুলে কি করতো জিজ্ঞেস করতেই সোজাসাপটা উত্তর-ক্যান, 'টোকাই আছিলাম'। টোকাই মুকুল জেলখানার পরিবেশের সাথে নিজেকে লাগসই করে নিয়েছে বলেই মনে হলো। অন্তত জীবনের বাস্তবতা বুঝে উঠার আগ পর্যন্ত ও যে জেলেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে সেটুকু ওর নিজের কথাতেই বোঝা গেল, "কি আর অইব! সাজা লমু।"

বন্দী শিশু-কিশোরদের মধ্যে যারা উচ্ছৃঙ্খল, পাজি ও বেশি মাত্রায় ত্যাঁদড়- ওদের সার্বক্ষণিক তালাবন্ধ করে রাখা হয় ১৪নং পানিশমেন্ট সেলে। ১৪নং সেলের বর্ণনায় এক কথায় বলা যায়- বীভৎস! রাস্তা থেকে ধরে এনে জেলে পুরে রাখা হয়েছে- এমন কিশোর বন্দীর সংখ্যাই বেশি। ওরা নিজেরা জানে না কি ওদের অপরাধ; কি কারণে ওদের জেলে নরকবাস করতে হচ্ছে। অনেকের অল্প মেয়াদের সাজাও হয়েছে। এনিয়ে ওদের কোন মাথা ব্যথা নেই। শুনেছে, সাজা হয়েছে- এটুকুই। কবে সাজা হলো, কি কারণে সাজা হলো, কোন আদালতে, উকিল কে ছিল- এর কোন কিছুই ওদের জানা নেই।

মনির নামের দশ বছরের ছেলেটির জামিন হয়েছে শিশু আদালতে। বিজ্ঞ বিচারক রায়ের শর্তে লিখেছেন- মা অথবা বাবাকে জামিন নামায় সই করে ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। তিন মাস হলো, ওর দেয়া ঠিকানায় ওর বাবা-মায়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না; ফলে ওর মুক্তি হচ্ছে না। কেন্টনমেন্ট এলাকার চৌদ্দ বছর বয়সের ফারুক ও ছোট ভাই তারেকের শাস্তি হয়েছে তিন বছর করে। ছিনতাইকালে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল এই দুই সহোদর। সাধারণত এই জাতীয় মামলায় সাক্ষীর অভাবে সাজা হতে দেখা যায় না। বিনা উকিলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। দশ সেলের ফুট-ফরমায়েশ খেটে ওদের দিন চলে। জেলখানায় ফারুককে সবাই মজা করে 'ডাকাত' ডাকে। এতেই 'ও' খুশি।

ছেলেটির নাম কাউসার। সবাই ডাকে ছিনতাইকারী কাউসার বলে। এতে ওর লজ্জায় আড়ষ্ট হওয়াতো দূরের কথা, উপরন্তু একটুখানি আত্ম-অহংকার নিয়েই চটজলদি প্রতিউত্তর- বলেন স্যার! বয়েস বিশের বেশি নয়। চলনে বলনে ভাল। উস্কে না দিলে চুপচাপ থাকতেই ভালবাসে। থাকে শাহবাগ পিজি স্টাফ কোয়ার্টার বস্তিতে। মা ও ছোট বোন থাকে মিরপুর বিএনপি বস্তিতে, জীবন চলে গার্মেন্টিসে চাকুরি করে। বাবা খুনের দায়ে যাবজ্জীবন সাজা খাটছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। পথ বিভ্রান্ত এই তরুণ কষ্টের অনুভূতিতে নাড়া দেয় বটে, তবে ওর সাথে পরিচয় না হলে জীবনের এই নির্মম সত্যটি জানা হতো না যে কেমন করে জীবনের ঊষালগ্নে, অপ্রতিহত অভাব স্নিগ্ধ তারুণ্যকে টোকাই থেকে ছিনতাইকারীতে পরিণত করে। কেমন করে জীবনের মানে বুঝে উঠার আগেই গ্রেফতার ও নির্যাতনের বাস্তবতাকে অবলীলায় মেনে নিয়ে ছুরি হাতে রাজপথে দাঁড়িয়ে যায় পেটের তাগিদে।

www.pathagar.com

গণপিটুনি ও বেহিসাবি পুলিশী মাইরে অভ্যস্ত কাউসারকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই নির্দ্বিধায় বলে উঠলো, "ও কিছু না স্যার, এই লাইনে থাকলে মাইরতো কমবেশি খাওন লাগবই।" ওর ছিনতাই এর এলাকা দোয়েল চত্বর থেকে টি,এস,সি হয়ে শাহবাগ ও কাঁটাবন পর্যন্ত।

বাবাকে ওর মনে নেই। ছোট্টবেলা থেকেই মা বলেছে, বাবা ফিরে আসবে। তারপর একযুগ পার হলো বাবা ফিরে আসেনি। মাকে দেখেছে, মাঝে মধ্যে ঢাকা আসতে বাবার সাথে জেলে দেখা করতে কখনো সঙ্গে আসার সুযোগ হয়নি। সেই অভিমানে একবার মার পিছু নিয়ে সেই যে ভুল লঞ্চে চড়ে বসলো, আর ওর গ্রামে ফিরে যাওয়া হয়নি। এরপর অনেকদিন পার হয়েছে। অভাবের তাড়নায় মা ছোটবোনকে নিয়ে গ্রাম ছেড়েছে। শেষ অবধি মায়ের সন্ধান কাউসার পেয়েছিল বটে, কিন্তু মায়ের স্নেহ-সান্নিধ্যে থাকার নিরবচ্ছিন্ন মানসিকতা তদ্দিনে হারিয়ে ফেলেছে। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস, পিতা-পুত্রের প্রথম পরিচয় কেন্দ্রীয় কারাগারে একজন খুনী, আরেকজন ছিনতাইকারী।

কাউসার চাকুরি করতো টি.এস.সির সড়ক দ্বীপের খাবারের দোকান ডাসে। ভালই ছিল। হঠাৎ দুর্ভাগ্য এসে ভর করলো ওর উপর। চাকুরি গেল চলে। দু'চারদিন ফুটপাতের দোকানে ফুট-ফরমায়েশ খাটত। এরপর অপ্রতিহত অভাব বালক কাউসারের ক্ষুদে মানবিকতাকে বিভ্রান্ত করে ওকে বানিয়ে দিল ছিনতাইকারী। বন্ধুও জুটে গেল। চার বন্ধু মিলে যুক্তি হলো, মালিকসহ গাড়ি ছিনতাই করে জোরজবরদস্তি করে সই সাবুদ নিয়ে কার সেন্টারে বিক্রি করে দিবে। হাস্যকর! বালক ছিনতাইকারীর দল ঘুর্ণাক্ষরে বুঝতে পারে নাই, যে দেশে মালিক স্বয়ং গাড়ি বিক্রি করতে চাইলে বিআরটি এর চৌদ্দ ঘাটের অহেতুক যন্ত্রণার কারণে গাড়ি চালানোর খায়েশ আজন্মের তরে হিরোহিত হয়, সেই দেশে কাগজে সই নিলেই গাড়ি বিক্রি হয় না। হওয়া সম্ভবও নয়। পরিকল্পনা মতো, বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের গেইটে লম্বা বাঁশ হাতে রাস্তার দুধারে দু'জন করে দাঁড়িয়ে গেল। শীতের কুয়াশা ভরা রাত। টিএসি'র দিক থেকে সাদা রং এর একটি প্রাইভেট কার ঘন ঘন ওয়াইপার চালিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। নিঝুম রাতের আলো–আঁধারীতে হঠাৎ বাঁশের ব্যারিকেড পেয়ে গাড়িটি আচমকা দাঁড়িয়ে গেল। সামনে ড্রাইভার, পিছনের আসনে একজন মাঝবয়েসী মহিলা। কাউসারের ভাষায়- "ড্রাইভারের গলায় একটা খুরের টান মারতেই মহিলা ডরে ব্যানিটি ব্যাগ আগাইয়া দিল। সাত হাজার ট্যাকা পাইলাম, নিলাম না। বোঝাবার পারি নাই। ট্যাকাও গেল। মাইরও খাইলাম, জেলও খাটলাম।" তিন দফায় জেল খেটেছে প্রায় তিন বছর। কিভাবে বিচার হয়- এনিয়ে ওর কোন ওজর আপত্তি নেই। বের হওয়া নিয়েও কেন মাথাব্যথা নেই। সুঠাম দেহ, যতোসব কষ্টের কামকাজগুলো ওর ভাগে জোটে। এ নিয়েও ওর কোন বালাই নেই। ঠাট্টা মশকারা করে বললাম, কিরে কাউসার, রোযার ঈদতো ধরতে পারলি না, ভাল আয় রোজগার হতো। ওর সোজাসাপটা উত্তর, "কোরবানীর ঈদ পাইলেই অয়। গরু কেনার মোটা

www.pathagar.com

পার্টি থাকে। কায়দা মতো একটা ধরতে পারলেই কাফি।" যাইহোক, আমার এই ইতিবৃত্ত হয়তো বালক কাউসারের জীবন-মানের কোন গুণগত পরিবর্তন আনবে না। পাঠকজনের মনে যদি এই অভাগা তরুণের জন্য এতটুকু করুণার উদ্রেগ হয়, সেই মঙ্গল, সেই ভাল।

মেন্টাল এরিয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে কেন্দ্রীয় কারাগারের একমাত্র লাইব্রেরী। বলা হয়-বই অলস সময়ের প্রকৃত বন্ধু। বন্দী জীবনে শিক্ষিত ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সময় কাটানোর একমাত্র উপায় লাইব্রেরী। রুচিশীল মানুষের বেঁচে থাকার সেই একমাত্র উপায়টিও জেলখানায় উপেক্ষিত। ভাতে মরা বন্দীদের মনের খোরাক যোগানোর এই কৃপণতা ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে হার মানায়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কারাগারের একমাত্র লাইব্রেরীর দৈন্যদশা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গোটা পাঁচেক আলমারি, বাংলা সাহিত্যের কিছু ওল্ড ক্লাসিক, ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় পুস্তক এবং হাল আমলের সস্তা দরের কিছু উপন্যাস-এই নিয়ে লাইব্রেরীর পুস্তক সম্ভার। বইগুলো কোন আমলে কেনা হয়েছিল জানি না। তবে যতদূর দেখেছি, কোন বইয়েরই সবগুলো পাতা আছে বলে মনো হলো না। মজার বিষয়, প্রায় প্রতিটি বইয়েরই প্রথম কিংবা শেষ পাতা নেই। লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনাও তথৈবচ। জেলখানার দুইজন প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক শিক্ষকতা ছেড়ে লাইব্রেরিয়ান সেজে বসে আছেন। লেখাপড়া করাচ্ছেন গুটিকতক কয়েদি। লাইব্রেরিয়ান হলেও আদতে ওনাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান আছে বলে মনে হলো না, থাকার কথাও না। বই ইস্যু ও ফিরতি বইয়ের রেজিস্ট্রার মিলানোর সেকি হাহুতাশ! লাইব্রেরিতে বই তুলতে গেলে এমন অহেতুক ভোগান্তি যে, বই পড়ার তাবৎ সদিচ্ছারই অপমৃত্যু ঘটে। সকালে বই আনতে গেলে বলবে-বারো গুনতির পর আসেন। বার গুনতির পরে গেলে বলবে-কাল আসেন। কাল গেলে বলবে-মাস্টার সাহেবকে জেলার সাহেব ডেকেছেন, ব্যস্ত আছেন, আজ বই দেয়া সম্ভব না। বলা বাহুল্য, এই অদ্ভুত মানসিকতা বই হারানোর সতর্কতা নয়; দায়িত্ব পালনের অলসতা ও অজ্ঞতা মাত্র। বই পড়তে ঘুষ দিতে হয় ঢাকা জেল ছাড়া এমন ঘটনাস্থল পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

জেলখানার লাইব্রেরিকেন্দ্রিক কিছু শ্লাঘার বিষয় আছে। লাইব্রেরির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ওয়ার্ড ও মেন্টাল এলাকায় পরিচালিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৪০টি ক্যাটাগরিভিত্তিক স্কুল। শিক্ষিত কয়েদিদের থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে ১০০ জন শিক্ষক। শুনেছি, লাইব্রেরিয়ান প্রতি মাসে স্কুল পরিচালনার জন্য ৩০ হাজার টাকা পান। শতছিন্ন বই ও জোড়াতালি মার্কা শ্লেট দেখে টাকার সদ্ব্যবহার হচ্ছে বলে মনে হলো না। কথা হল জুনিয়র শিক্ষকের সাথে। দুঃখ করে বললেন, "এখানে অনেক বড় মাপের মানুষ আসেন। অনেকেই আশ্বাস ও কমিটমেন্ট দিয়ে যায়, অন্তত লাইব্রেরির জন্য কিছু করবেন। পরে যোগাযোগ করেছি অনেকের সাথে। কেউ কথা রাখেনি"।

www.pathagar.com

বিশ
শেষ কথা

জেলখানা নিয়ে আমার কথাই যে 'শেষ কথা' নয় এইটুকু উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান আমার আছে। কারণ, জাত যাবার ভয়ে জেলবন্দীদের দুর্গতির অবসানের লক্ষ্যে কেউ কথা বলতে চান না। জেলজীবনের উপর কি একটা অদৃশ্য সংস্কারের রেখা টানা আছে, যা কেউ লঙ্ঘন করেন না, করতে চান না। কিন্তু সংস্কারের মুক্তি তো আর যুক্তিতে হয় না। লেখায় হয় না। তাই অনুনয় রইল, লক্ষ্য না হোক, উপলক্ষ করে হলেও যেন মন্ত্রী-মিনিস্টার ও এমপি মহোদয়রা জেল দুর্গতদের নিয়ে দু'চারটি কথা বলেন। বিভিন্ন সরকারের আমলে বন্দীদের জীবন মানের উন্নয়নের জন্য বহুবার সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশন উড়োজাহাজে উড়ে অসংখ্য দেশ ঘুরে পাঁচতারা হোটেলে থেকে রংবেরং এর জেলখানা দেখে এসেছেন। গাদা গাদা সুপারিশসহ প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনও পেশ করা হয়েছে দফায় দফায়। কাজের কাজ হয়নি কিছুই। এই নির্মম পরিহাসে বিপর্যস্ত কয়েদিদের বলতে শুনেছি, "জেলখানার উন্নতির দরকার নেই। দুর্নীতি বন্ধের ব্যবস্থা করা হলে বন্দীদের জন্য যা আছে, তাতেই কোন রকমে বেঁচে থাকবার উপায় হবে"।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বসমাজ যখন ভাবীকালের স্বপ্নে বিভোর, শতাব্দী ও সহস্রাব্দকে পিছনে ফেলে বিবর্তন ও পরিবর্তনের স্রোতধারায় সামনে চলাই যখন সার্বজনীন মোদ্দাকথা, তখন আমাদের কারাগারগুলো কেন যে প্রাগৈতিহাসিক জড়তাকে আঁকড়িয়ে ধরে পিছনে ফিরে চলার প্রত্যাখ্যাত পথকে পাথেয় করে নিয়েছে তা বলা মুশকিল। কালে কালে জেল বিধানের পরিবর্তন হয়নি এমন নয়; কিন্তু পরিবর্তনে অভাগা বন্দীদের ভাগ্যবিড়ম্বনার অবসান ঘটেনি। বৃটিশ গেল, ভারত ভাঙলো, উদ্ভব হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। মূলোৎপাটন হলো না শুধু বৃটিশদের রেখে যাওয়া জেল বিধানের। জেলখানাগুলোকে সংশোধনাগারে পরিণত না করা গেলে শুধুমাত্র গ্রেফতার ও সাজা প্রদান করে যে সমাজের অস্থিরতা নিরসনে ভূমিকা রাখা যায় না সে কথা অনুধাবনের জন্য বিশেষ কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বিশ্বব্যাপী যখন একবিংশ শতাব্দীর মহাজাগরণের প্রস্তুতি চলছে, তখন আমাদের জেলখানাগুলোর এই বেহাল অবস্থা পুরো সমাজ ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। সমাজের এই ক্ষত চিহ্নকে বেমালুম চেপে গিয়ে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুখী বাংলাদেশ গড়ার পলিটিক্যাল তুবড়িবাজি নিতান্তই পরিহাস মাত্র। আর যদি ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতাহীনদের দুর্বিষহ জেলজীবন নিয়ে সুখ পেয়ে ভাবেন, থাকনা। তাহলে বলতে হয় –"পরের অনিষ্টের চিন্তা করে যেইজন, নিজের অনিষ্টের বীজ করে সে বপন।" ক্ষমতা কারো জন্য চিরস্থায়ী নয়। আজ যারা রাজপ্রাসাদে রাজত্ব করছেন, কাল এরা রাজপথে সংগ্রাম-ক্লিষ্ট পথ চলবেন এইতো নিয়ম। রাজপথ ও মসনদের অদলবদলের পালায় কারাগার কারো জন্যই অসম্ভবপর বিষয় নয়। পরের সর্বনাশের কথা ভেবে আজ যারা কারা সংসকারের পথ মাড়ালেন না প্রকান্তরে তারা নিজেদের দুর্বিষহ জেলজীবনের পথকেই প্রশস্ত করে রাখলেন। সত্যি কথা কি, ইতিহাসের শিক্ষাই এইরকম যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না।

তবু একবিংশ শতাব্দীর এই ঊষালগ্নে আমরা নতুন লিখিয়েরা এই প্রত্যাশাটুকু রেখে যেতে চাই–আমার এই কথাই যেন শেষ কথা হয়, গেল শতাব্দীর মতো চলতি শতকে আর যেন কোন কবিকে বলতে না হয়;

নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।

www.pathagar.com